স্কয়ার

স্বাস্থ্য এবং ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী

১৭ তম
বর্ষ ২০১৫

- জলবসন্ত (চিকেন পক্স)
- লিউকোরিয়া
- ধনুষ্টংকার
- প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ
- উচ্চ রক্তচাপ
- শিশুদের ডায়রিয়া

ISSN 1682-0541

স্কয়ার
ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড
বাংলাদেশ

CERTIFIED ISO 9001 COMPANY

সূচী

জলবসন্ত (চিকেন পক্স) ০১

লিউকোরিয়া ০২

ধনুষ্টংকার ০৩

প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ ০৪

উচ্চ রক্তচাপ ০৭

শিশুদের ডায়রিয়া ০৯

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ,

আপনাদের প্রিয় স্বাস্থ্য ও ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী ‘‘স্কয়ার’’ এর ২০১৫ সালের সংখ্যাটি আপনাদের হাতে পৌছে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। বর্তমান সংখ্যায় আমরা অত্যন্ত জরু রী কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা তুলে ধরেছি যা আমাদের প্রতিনিয়ত মোকাবেলা করতে হয়।

আশাকরি, প্রকাশিত বিষয়গুলো আপনাদের কাজে আসবে। আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আমাদের বাংলা ‘‘স্কয়ার’’ সাময়িকী প্রকাশে অনুপ্রাণিত করবে।

পরিশেষে, ‘‘স্কয়ার’’ পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের ও আপনাদের পরিবারের সকলের সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করছি।

শুভেচ্ছাসহ

ডাঃ ওমর আকরাম-উর রব

১৭তম বর্ষ, ২০১৫

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
ডাঃ ওমর আকরাম-উর রব

নির্বাহী সম্পাদক
ডাঃ মোঃ মাহফুজুর রহমান সিকদার

সহযোগী সম্পাদকমন্ডলী
ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি রায় চৌধুরী
ডাঃ রেজাউল হাসান খান
ডাঃ মোঃ মোসাদ্দেক হোসাইন
ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল আবেদীন

সহযোগিতায়
প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ISSN 1682-0541
Key title: Skayara

জলবসন্ত (চিকেন পক্স)

চিকেন পক্স বা জলবসন্ত ভ্যারিসেলা জোস্টার ভাইরাস ঘটিত অতি মাত্রায় ছোঁয়াচে একটি রোগ। এই রোগে ছোট বড় সবাই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সাধারণত ছোটদের ক্ষেত্রেই এই রোগ বেশি দেখা যায়। শীতের শেষে, বা বসন্ত কালে এই রোগ বেশি দেখা গেলেও বছরের যে কোন সময়ে এই রোগ দেখা যেতে পারে। এই রোগ সাধারণত নিজে নিজেই সেরে গেলেও, ভাল হয়ে যাওয়ার পরও এই রোগের জীবণু শরীরে থেকে যেতে পারে যা পরে সক্রিয় হয়ে হারপিস জোস্টার নামক রোগের সৃষ্টি করতে পারে।

জলবসন্ত হলে কি হয় ?

জলবসন্ত সাধারণত মৃদু লক্ষণ বিশিষ্ট একটি রোগ যা কোন ধরনের জটিলতা ছাড়া নিজেই ভাল হয়ে যায়। সাধারণত এক সপ্তাহে বা ক্ষেত্র বিশেষে আরো বেশি সময় ধরে এই লক্ষণগুলো থাকতে পারে।

জলবসন্ত

এই সময় সামান্য জ্বর হতে পারে, শরীরের চামড়ায় লাল ফুসকুড়ি বা ফোস্কা দেখা যেতে পারে এবং আক্রান্ত স্থানে চুলকানি হয়। রোগের শেষ দিকে ফোস্কা শুকিয়ে মরা চামড়া উঠে আসে। খুব কম ক্ষেত্রেই এই রোগ জটিল আকার ধারন করে। ফোস্কা দেখা দেয়ার ২/৩ দিন আগে থেকেই শরীরের অন্যান্য লক্ষণগুলো দেখা যায়।

এই রোগে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে শরীরে অবসাদ, মাথা ব্যথা ও জ্বর দেখা যেতে পারে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে এর সাথে মাংস পেশীতে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, উচ্চ মাত্রায় একটানা জ্বর হতে পারে। জলবসন্তের সুনির্দিষ্ট লক্ষণ হল চুলকানি হয় এমন ফুসকুড়ি বা ফোস্কা যা বুক/পিঠ থেকে শুরু হয়ে মুখে ছড়িয়ে পড়ে এবং মাথার চামড়া, মুখ গহ্বর ও কানেও দেখা যেতে পারে।

কিভাবে এ রোগ ছড়ায় ?

আগে এই রোগে কখনো আক্রান্ত হয় নি এমন সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। গর্ভস্থ শিশু থেকে পূর্ণ-বয়স্ক সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এই রোগে একবার আক্রান্ত হলে ভবিষ্যতে আর রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণত এই রোগ একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে বায়ুবাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। হাঁচি-কাশি, ফোস্কা থেকে ছড়িয়ে পড়া জীবাণু নিঃশ্বাসের মাধ্যমে অথবা সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

ফোস্কা দেখা দেয়ার ২/৩ দিন আগে থেকে ফোস্কা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত (সাধারণত ৫-৭ দিন) এই রোগ আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে ছড়াতে পারে। আক্রান্ত হওয়ার পর সাধারণত ১১ থেকে ২১ দিন পর এই রোগের লক্ষণ দেখা যেতে শুরু করে। সাধারণত শতকরা ৮৫ ভাগ ক্ষেত্রেই একই বাসায় থাকা অন্যান্যদের শরীরে এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে মায়ের শরীর থেকে গর্ভস্থ বাচ্চার শরীরে এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এই রোগে আক্রান্ত হলে কি করতে হবে ?

ভাইরাস নাশক কোন ওষুধ ছাড়াই সাধারণত এই রোগ ভাল হয়ে যায়। রোগের বিভিন্ন লক্ষণ প্রশমিত করার জন্য বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। জ্বর, মাথা ব্যথা ও মাংস পেশীতে ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল জতীয় ওষুধ এবং চুলকানির জন্য এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ নেয়া যেতে পারে। জটিল রোগীদের ক্ষেত্রে এন্টি-ভাইরাল ও স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে সেবন করা যেতে পারে। ত্বকে জীবাণু সংক্রমন হলে এন্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করতে হতে পারে।

এই রোগে আক্রান্ত হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার স্বাভাবিক নিয়মাবলি মেনে চলতে হবে। হালকা সুতি কাপড় পরিধান করলে এই সময় কম অস্বস্তি অনুভূত হয়। ত্বক এবং জামা কাপড় নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে ত্বকে জীবাণু সংক্রমণ না হতে পারে।

কখন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন ?

- ❒ জ্বর এর মাত্রা খুব বেশি হলে
- ❒ ত্বকে জীবাণু সংক্রমণ দেখা দিলে
- ❒ বুকে ব্যথা হলে বা নিঃশ্বাসে সমস্যা হলে
- ❒ লসিকা গ্রন্থি ফুলে গেলে বা ব্যথা হলে
- ❒ অণ্ডকোষ ফুলে গেলে বা ব্যথা হলে
- ❒ গর্ভবতী মা আক্রান্ত হলে
- ❒ যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম [যেমন- নবজাত শিশু, এইডস বা ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে]

কিভাবে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায় ?

অন্যের শরীরে এই রোগ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করতে ফোস্কা দেখা দেয়ার সময় থেকে সব ফোস্কা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত রোগীকে সুস্থ ব্যক্তিদের থেকে আলাদা রাখতে হবে। তবে ফোস্কা দেখা দেয়ার ২/৩ দিন আগে থেকে আক্রান্ত ব্যক্তি এই রোগ ছড়াতে শুরু করে বলে এই রোগ প্রতিরোধ করা কঠিন। সময়মত জলবসন্তের টিকা নিয়ে এই রোগ কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

এই রোগে কি ধরনের জটিলতা হতে পারে ?

এই রোগ গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে গর্ভের প্রথম তিন মাসে, বিশেষ জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। পরিণামে মা এবং তার সন্তান উভয়ের ক্ষতি হতে পারে। ফলে গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু বা বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম গ্রহণ করতে পারে। বড়দের ক্ষেত্রে এই রোগে কিডনির সমস্যাসহ আরো অন্যান্য অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে যা শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত কখনই জটিল আকার ধারণ করে না। এই কারণে বড়দের ক্ষেত্রে এই রোগ প্রতিরোধক টিকা গ্রহন করা বেশি জরুরী।

এই রোগের জীবাণু শরীর থেকে কখনই সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। শরীরের স্নায়ু তন্ত্রের এক জায়গায় অবস্থান করে ঘুমন্ত/সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পুনরায় সক্রিয় হলে এই জীবাণু শরীরে আবার শিঙ্গেলস (Shingles) নামক রোগ তৈরী করতে পারে যাতে শরীরের কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে ফোস্কা বা ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। শিঙ্গেলস জলবসন্তের তুলনায় যদিও কম সংক্রামক, এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি অন্যান্যদের শরীরে জলবসন্তের সংক্রমন ঘটাতে পারে। শিঙ্গেলস আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পোস্ট-হারপেটিক নিউরালজিয়া নামক তীব্র ব্যথাদায়ক এক সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে।

তথ্যসূত্র

❒ স্কয়ার

লিউকোরিয়া

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় লিউকোরিয়া, সাধারনের কাছে সাদাস্রাব হিসেবে বেশী পরিচিত। পৃথিবীর সকল মেয়েদেরই তাদের জীবনের কোন এক সময়ে স্বাভাবিক মাত্রায় সাদাস্রাব হয়ে থাকে। মেয়েদের জীবনচক্রের ইতিহাস অনুযায়ী তাদের শারীরবৃত্তীয় কারণে বিভিন্ন বয়সে এ স্রাব সামান্য পরিমানে বাড়তে পারে যা কোন ক্ষতিকর রোগ নয়। তবে সাধারনত যে সময়ে সাদাস্রাব হয়ে থাকে তা হল-

- সাবালিকা হওয়ার সময়
- সন্তান সম্ভব্য হলে
- যৌন উত্তেজনার সময়
- মাসিক ঋতুস্রাব-এর আগে বা পরে

এ ক্ষেত্রে সাদাস্রাব হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

স্বাভাবিক মাত্রার সাদাস্রাব বা দুই পিরিয়ডের মাঝখানে সাদাস্রাব হলে তা নিয়ে দুশ্চিন্তার যেমন কোন কারণ নেই তেমনি বেশী মাত্রার সাদাস্রাব বা লিউকোরিয়া হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

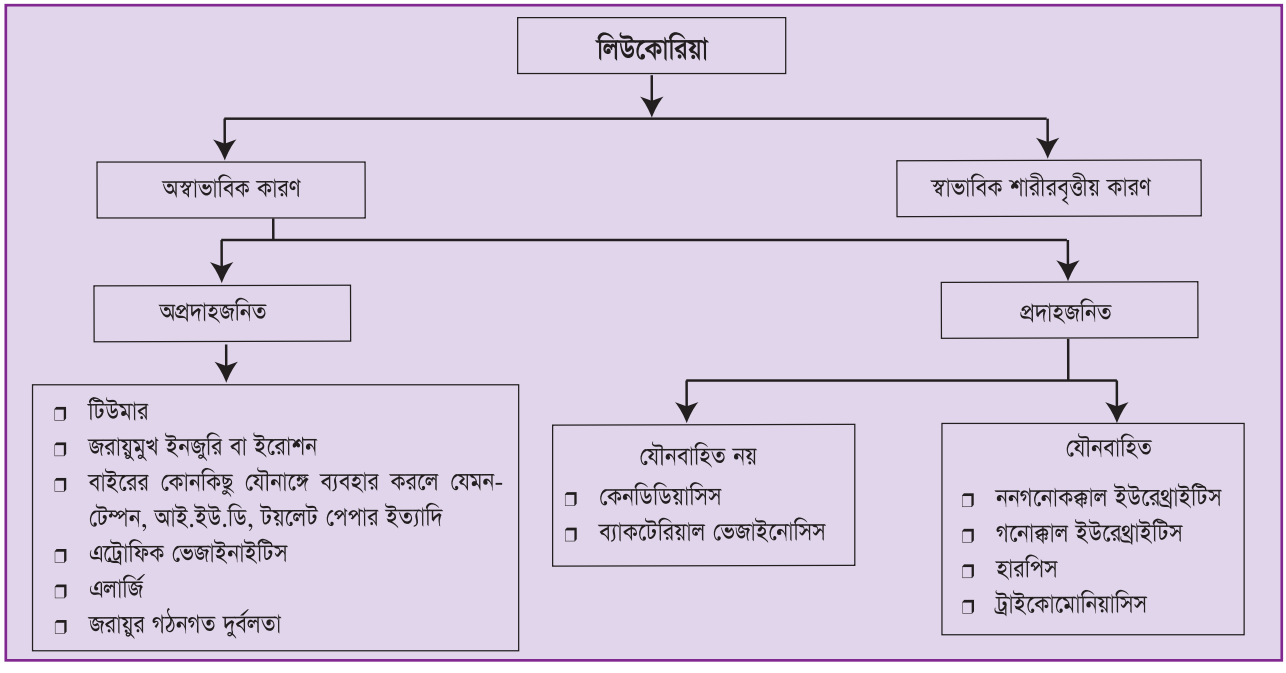

লিউকোরিয়ার কারণ ঃ

বিভিন্ন কারনে লিউকোরিয়া বা অস্বাভাবিক স্রাব হতে পারে। যেমন-

- অরক্ষিত যৌন আচরণ
- পুষ্টিহীনতা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব
- জরায়ু মুখে ইনজুরি বা ইরোশন
- হরমোনের তারতম্য হলে
- ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস বা প্যারাসাইটিজনিত সংক্রমণ
- ডায়াবেটিস ও রক্তশূন্যতাজনিত শারীরিক দুর্বলতা

জরায়মুখে ইরোশন হলে ডাক্তারী পরীক্ষায় সাধারণত তা বোঝা যায়। অতিরিক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত সাদাস্রাবের সাথে কোমরে ব্যথা থাকলে তা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমনের কারণে হয়ে থাকে। নোংরা কাপড়চোপড় থেকে সাধারনত ফাঙ্গাসের সংক্রমণ হয়। এক্ষেত্রে স্রাবের সাথে অসম্ভব চুলকানিও দেখা যায়। তবে ইরিটেশন বা ইনজুরিজনিত লিউকোরিয়াতে কোন চুলকানি থাকে না।

লিউকোরিয়ার লক্ষণ ঃ

- দুর্গন্ধযুক্ত অতিরিক্ত সাদাস্রাব কখনো কখনো হলদেও হয়ে থাকে
- স্রাবের সাথে কোমরে যন্ত্রনা থাকতে পারে
- অতিরিক্ত স্রাবের জন্য কাপড়ে বিশ্রী দাগ হয়ে যাওয়া
- জরায়ুপথে চুলকানি
- শরীর দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাওয়া

চিকিৎসা ঃ

লিউকোরিয়ার চিকিৎসার জন্য অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। চিকিৎসকই এর কারণ নির্ণয় করে উপযুক্ত চিকিৎসা দিবেন। এ রোগের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের শরনাপন্ন হওয়া যতটা প্রয়োজন, ব্যক্তিগত জীবনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ঠিক ততটাই প্রয়োজন।

মেয়েদের যৌনাঙ্গের স্থানগুলো সাধারনত স্যাঁতসেঁতে থাকে। আবার সবসময় আবৃত থাকা এবং এ কারণে অতিরিক্ত ঘামের দরুন এ জায়গাগুলো সহজেই ফাঙ্গাস বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সহজেই সংক্রমিত হয়।

কাজেই প্রতিদিন কাপড়-চোপড় ধুয়ে এবং পুরোপুরি শুকিয়ে পরিধান করলে এ সংক্রমন থেকে মুক্ত থাকা যায়। আবার পুরুষের কাছ থেকেও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমন হতে পারে। তাই নিজের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি স্বামীর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাও সমানভাবে জরুরী। এর সাথে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারও গ্রহন করা উচিৎ। এ ব্যবস্থাগুলো ঠিকমতো গ্রহন করলে লিউকোরিয়া সাধারনত ভাল হয়ে যায়। তবে মনে রাখতে হবে দীর্ঘদিন ধরে লিউকোরিয়া বিনা চিকিৎসায় থাকলে বিশেষত ইরোশনজনিত লিউকোরিয়া থেকে জরায়ুর মুখে ক্যান্সার হতে পারে।

তথ্যসূত্র

- স্কয়ার

ধনুষ্টংকার

ধনুষ্টংকার বা টিটেনাস ক্লসট্রিডিয়াম টিটেনি নামক ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণের কারণে ঘটে যা থেকে শরীরে টিটেনোস্প্যাজমিন নামের বিষ বা টক্সিন তৈরি হয়। এ রোগ শরীরের স্নায়ুতন্ত্র কে আক্রমন করে যাতে শরীরের মাংসপেশি শক্ত হয়ে যায় এবং প্রচুর খিঁচুনি হয়। সাধারনত ঘাড় এবং চোয়ালের মাংসপেশিতে রোগের লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পায় এবং পরবর্তীতে স্বাভাবিক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়াতে বাঁধার সৃষ্টি করে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

ধনুষ্টংকার কেন হয় ?

এই রোগের জীবাণু সাধারনত মাটি, ধুলাবালি, গোবর, ময়লা-আবর্জনা, লোহার মরিচা ইত্যাদির মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় লুকিয়ে থাকে এবং শরীরের কোন ক্ষতের মাধ্যমে প্রবেশ করে আমাদের আক্রান্ত করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে, যেমন-

- ক্ষতে ময়লা আবর্জনা থাকলে। যেমন- সড়ক দূর্ঘটনা অথবা ময়লা পেরেক, টিন, পিন ইত্যাদি দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হলে বা দীর্ঘদিনের ক্ষতে ময়লা আবর্জনা থাকলে
- আগুনে পুড়ে গেলে
- মানুষের কামড় বা জীবজন্তুর দংশনে
- দূষিত যন্ত্র দিয়ে অস্ত্রোপচার করলে
- মায়ের জরায়ুতে ভ্রুণের মৃত্যু হলে
- দূষিত সিরিঞ্জ দিয়ে ইনজেকশন নিলে
- প্রসবকালীন দূষিত উপায়ে নাড়ি কাটলে অথবা ছাই, মাটি ইত্যাদি দিয়ে নাভি আবৃত করলে
- গ্রামীণ অঞ্চলে পশুর মলের মাধ্যমে শরীরের যে কোন কাটা স্থানে জীবাণুটি আক্রমণ করে থাকে

জীবাণু আক্রান্ত হওয়ার পর সাধারনত ৩ থেকে ২১ দিন পর (গড়ে ১০ দিন) রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্ষতের ধরন অনুযায়ী রোগের লক্ষণ

প্রকাশ পেতে কয়েক মাসও লেগে যেতে পারে।

ধনুষ্টংকারে কি কি লক্ষণ দেখা দেয় ?

এ রোগে আক্রান্ত হলে শুরুর দিকে ঘাড়, শরীরের পেছন দিক এবং পেটে ব্যথা ও জ্বর হতে পারে। মাংসপেশিগুলো সংকুচিত হতে থাকে এবং প্রচুর খিঁচুনি হতে পারে। মুখের মাংসপেশিগুলো শক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে হাঁ করতে অসুবিধা হয়। শরীরের পেছনের মাংসপেশিগুলো সংকুচিত হয়ে পুরো শরীর ধনুকের মতো বেঁকে যেতে পারে। নবজাতকদের বেলায় জন্মের ৩-২৮ দিনের মধ্যে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং শিশু বুকের দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়, শিশুর মুখ ও চোয়াল শক্ত হয়ে যায় এবং জোরে কাঁদতে পারে না। যে কোনো ব্যথা, শব্দ, আলো ইত্যাদির কারণে খিঁচুনি শুরু হতে পারে যা কয়েক মিনিট স্থায়ী হয় এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট হয় যার ফলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। শরীরের কাটা জায়গা, যার মাধ্যমে জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে, সেখানে ইনফেকশন হতে পারে।

রোগ তীব্র হলে ঘন ঘন খিঁচুনি হয়। খিঁচুনিতে তীব্র ব্যথা অনুভব হয় এবং এর মাত্রা এতই বেশি হতে পারে যে হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে।

কিভাবে এই রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয় ?

সরাসরি রোগের লক্ষণ ও রোগের ইতিহাস পর্যালোচনা করা ছাড়া অন্য কোন পরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগ সনাক্ত করা যায় না। খিঁচুনি মস্তিষ্ক প্রদাহের (মেনিনজাইটিস) জন্য হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যেতে পারে।

এই রোগে আক্রান্ত রোগীকে জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়। ক্ষতস্থান উপযুক্ত জীবাণুনাশক দিয়ে অথবা সার্জারির মাধ্যমে পরিস্কার করে টিআইজি বা টিটেনাস ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইনজেকশন দিয়ে টক্সিনকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করা হয়। একই সাথে টিটেনাস ভ্যাক্সিনও দেয়া হয়। খিঁচুনি ও মাংসপেশির সংকোচন কমানোর জন্য বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। ক্ষতস্থানে অন্যান্য জীবাণুর সংক্রমন রোধে এন্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। রোগের মাত্রা খুব বেশি হলে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র (ভেন্টিলেটর) দিয়ে রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস নিশ্চিত করতে হয়।

কিভাবে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায় ?

এই রোগ প্রতিরোধ করতে টিটেনাস এর টিকা গ্রহন করা একমাত্র কার্যকরী ব্যবস্থা। দুর্ঘটনাবশত শরীরে কোন জায়গা ময়লা আবর্জনাযুক্ত কিছু দিয়ে কেটে গেলে বা কাটা স্থানে ময়লা আবর্জনা লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান ভাল করে পরিস্কার করে নিতে হবে। জীবাণু সংক্রমণের আশংকা থাকলে (যেমন- পুড়ে গেলে, মাংস থেতলে গেলে) টিটেনাস টক্সয়েড (সংক্ষেপে টিটি) ইনজেকশন নিয়মানুযায়ী নিতে হবে।

১৫-৪৫ বছর বয়সী নারীদের ধনুষ্টংকার রোধে পাঁচটি টিকা নেয়া জরুরী যা প্রসূতির সাথে সাথে নবজাতকদেরও এই রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে যদি আগে টিকা দেওয়া না থাকে তা হলে গর্ভকালীন পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে একটি এবং তার এক মাস পর আরেকটি মোট ২ বার টিকা দিতে হবে। যদি আগের গর্ভকালীন দুটো টিকা নেওয়ার ইতিহাস থাকে এবং পাঁচ বছরের মধ্যেই আবার গর্ভধারণ হয়ে থাকে তবে দ্বিতীয়বারে পঞ্চম মাসে একটি টিকা নিলেই হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে জন্মের পরপরই প্রথম এই টিকা দিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রথম টিকার ৪ সপ্তাহ পর দ্বিতীয় আরেকটি এবং আরো ৬ মাস পর তৃতীয় আরেকটি টিকা কমপক্ষে নিতে হয়।

তথ্যসূত্র

- স্কয়ার

প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ

প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণ। উন্নত বিশ্বে যদিও মাতৃমৃত্যুর হার অনেকখানি কমে গেছে তবে বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে এখনো এর পরিমান বেশি।

স্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রে ৫০০ মি. লি এর বেশি অথবা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রসবের ক্ষেত্রে ১০০০ মি. লি এর বেশি রক্তক্ষরণ হলে তাকে প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ বলা যায়। এই পরিমান রক্তক্ষরণ যদি প্রসবের পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে হয় তবে তাকে প্রাথমিক পর্যায় এবং ২৪ ঘন্টার পরে হলে তাকে পরবর্তী পর্যায় বলে অভিহিত করা হয়।

কারণ ঃ

প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণের কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. দৃঢ়তা : প্রসবের পরে যদি জরায়ু কোন কারণে (সংক্রমন বা ভেতরে কোন টিস্যু রয়ে গেলে) সংকুচিত হতে না পারে তবে এ ঘটনা ঘটে। এটিই অন্যতম প্রধান কারণ।

২. অসাবধানতাবশত যদি প্রসবের সময় জরায়ু, জরায়ুমুখ, যোনি বা এর আশে পাশের কোথাও আঘাতপ্রাপ্ত হয় তবে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

৩. টিস্যু: যদি গর্ভফুল বা নবজাতকের শরীরের কোন অংশ জরায়ুর মধ্যে রয়ে যায় তাহলে রক্তপাত বন্ধ নাও হতে পারে।

৪. যদি মায়ের রক্তের জমাটবাঁধা জনিত কোন অসুখ থাকে।

নিম্নে রক্তক্ষরণের সমস্যার কারণসমূহের ব্যপকতা দেওয়া হল-

কারণ	%
জরায়ুর সংকোচনে ব্যর্থতা	৭০%
ক্ষত	২০%
রয়ে যাওয়া টিস্যু	১০%
রক্ত জমাট বাঁধাজনিত অসুখ	১%

এছাড়া বেশ কিছু গবেষণায় আরও কিছু কারণ উঠে এসেছে। যেমন-

- প্রসবের ২য় ধাপে অগ্রসর না হওয়া (প্রসবের ৩টি ধাপ থাকে)
- গর্ভফুলের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান
- স্বাভাবিক প্রসবে নানান যন্ত্রের ব্যবহার
- গর্ভবস্থায় সময়কালের তুলনায় বড় শিশু
- উচ্চরক্তচাপ জনিত সমস্যা
- কৃত্রিমভাবে প্রসবের সূচনা ঘটানো
- অক্সিটোসিন দ্বারা প্রসব ত্বরান্বিত করা
- মায়ের অতিরিক্ত ওজনও কিছুটা ভূমিকা রাখে

কী ঘটে ?

গর্ভবস্থায় মায়ের শরীরে রক্তের পরিমান প্রায় ৫০% পর্যন্ত (৪ লিটার থেকে ৬ লিটার) বৃদ্ধি পায়। লোহিত রক্তকনিকার চেয়ে তুলনামূলকভাবে রক্তরসের পরিমান বেড়ে যাওয়াতে হিমোগ্লোবিনের ঘনত্ব কিছুটা কমে যায়। প্রসবের সময় যে রক্তক্ষরণ স্বাভাবিকভাবে হয় তা পূরণ হয় এই অতিরিক্ত রক্ত দ্বারা।

পূর্ণকালীন গর্ভাবস্থায় একজন মায়ের জরায়ুতে প্রতি মিনিটে প্রায় ৫০০-৮০০ মি. লি. রক্ত প্রবহিত হয়। জরায়ুর পেশীগুলো একটি বিশেষ ধরনের আড়াআড়ি ভাবে সজ্জিত থাকে। ফলে জরায়ু যখন সংকুচিত হয় তখন এর মধ্যে অবস্থিত রক্তনালীগুলো বাইরে থেকে চাপ পায় এবং রক্তপাত বন্ধে সহায়তা করে।

যদি কোন কারণে জরায়ু সংকোচন না হয় তাহলে রক্তক্ষরণ বাড়ে। এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং এটা সাধারণত বাচ্চা জন্মানোর সাথে সাথেই অথবা ৪ ঘন্টার মধ্যে ঘটে থাকে।

এছাড়া জরায়ু, জরায়ুমুখ, যোনি বা এর আশেপাশের অংশে যদি কোন আঘাত লাগে বা কোন জখম হয় তবে অনেক বেশি রক্তপাত হয়। কারণ গর্ভবতী নয় এমন একজন মহিলার তুলনায় একজন গর্ভবতী মায়ের শরীরের এই অংশগুলোতে রক্ত চলাচলের পরিমান অনেক বেশি থাকে।

আঘাতের কারণ হতে পারে বাচ্চার জন্মদান সেটা স্বাভাবিক বা অস্ত্রোপচার যে ধরনেরই হোক না কেন।

উপসর্গ ও লক্ষণ ঃ

যদিও প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণের লক্ষণ-উপসর্গগুলো খুব আকস্মিক তবে অনেক সময় ধীরে ধীরে রক্তক্ষরণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে এটা তখন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও পরে গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে দাড়ায়। নিচে এগুলো তুলে ধরা হলো-

রক্তপাতের পরিমান	রক্তচাপ (সিস্টোলিক)	লক্ষণ+উপসর্গ	অবস্থা
৫০০-১০০০ মি.লি.	১১০-১২০ মি.লি. পারদ	• নাড়ির গতি বৃদ্ধি • মাথা ঝিম ঝিম করা	স্বাভাবিক
১০০০-১৫০০ মি.লি.	৮০-১০০ মি.লি. পারদ	• দুর্বলতা • নাড়ির গতি বৃদ্ধি • গা ঘেমে যাওয়া	কিছুটা গুরুতর
১৫০০-২০০০ মি.লি.	৭০-৮০ মি.লি. পারদ	• অস্থিরতা • ফ্যাকাশে ভাব • প্রস্রাব কমে যাওয়া	মোটামুটি গুরুতর
২০০০-৩০০০ মি.লি.	৫০-৭০ মি.লি. পারদ	• তীব্র শ্বাসকষ্ট • প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া • প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া	খুবই গুরুতর

প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণের ব্যবস্থাপনা

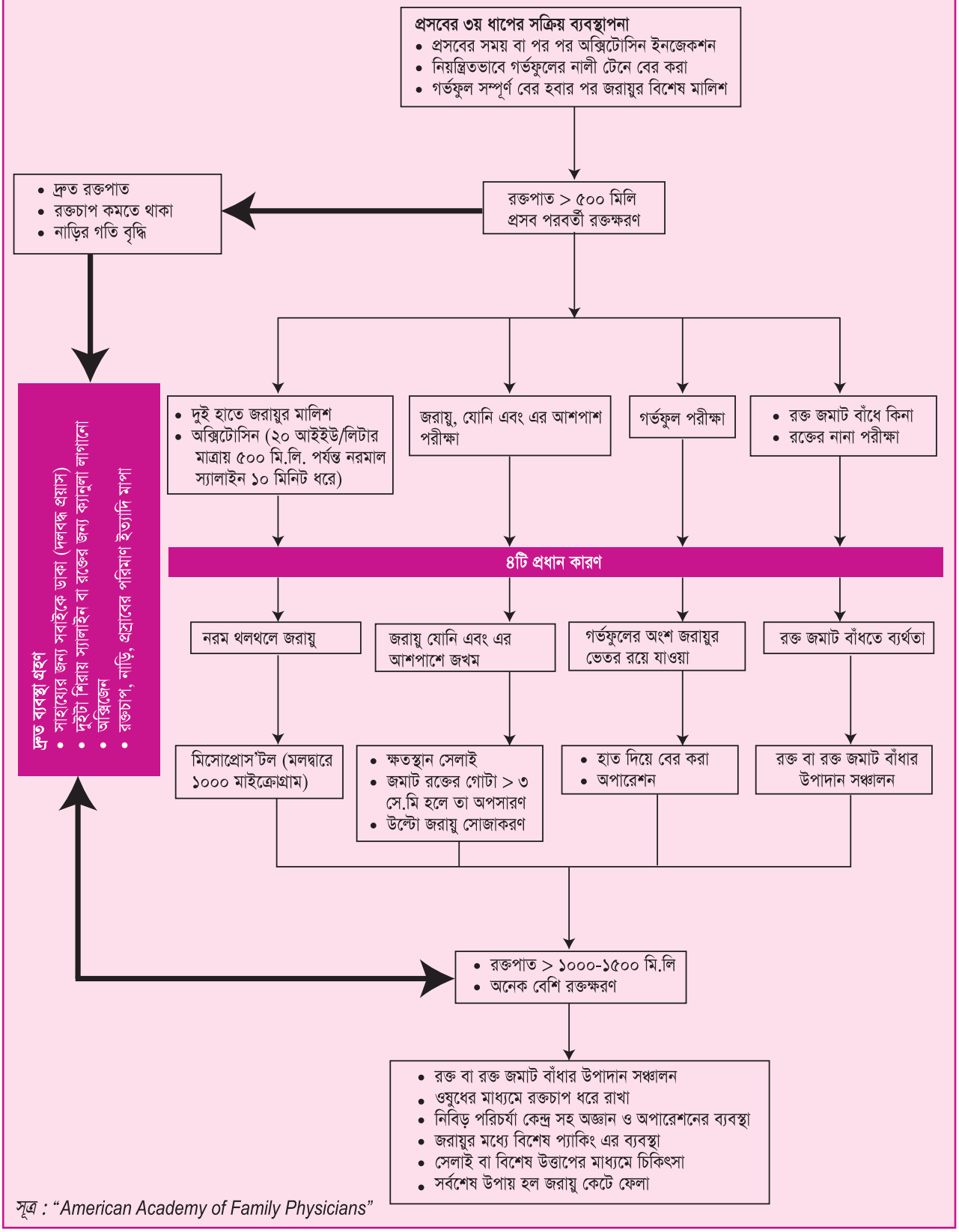

সূত্র : "American Academy of Family Physicians"

প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ

রোগ নির্ণয় এবং করণীয় ঃ

প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ এত দ্রুত প্রসার পায় যে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো ঐ মুহূর্তে রোগীকে দেখেই করে ফেলতে হয়।

রোগ নির্ণয়ের সূচনা ঘটে এটি বুঝতে পারার মাধ্যমে যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে কারণ বের করা যায়।

চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা আগের পৃষ্ঠায় ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

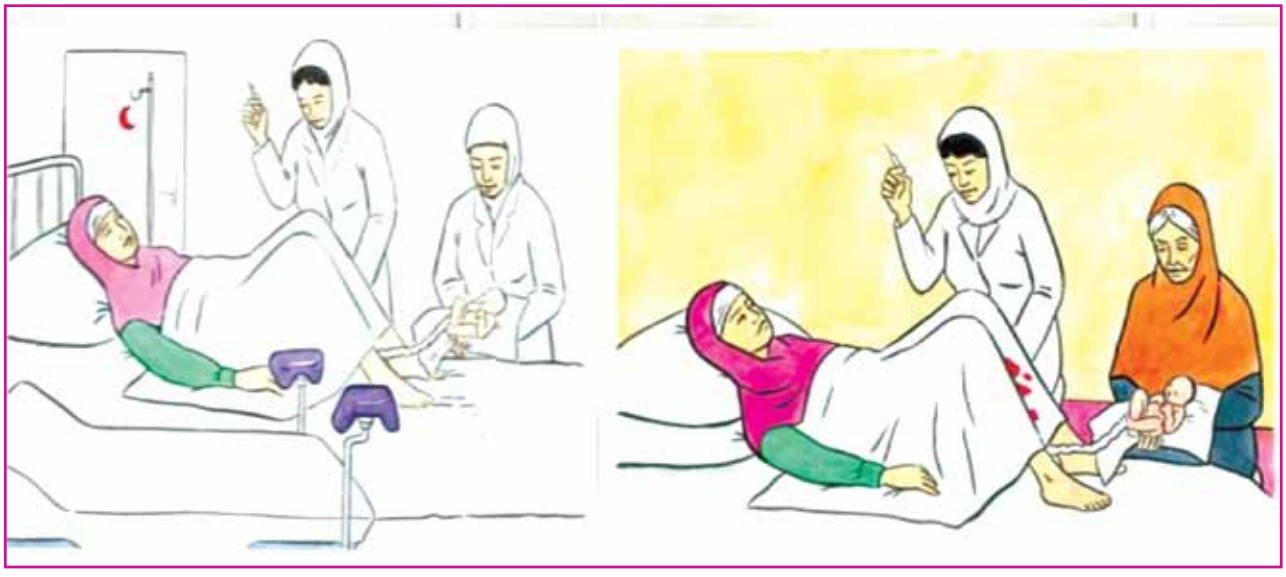

প্রতিরোধ ঃ

যে অল্প কয়েকটি মারাত্মক সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব তার মধ্যে প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ অন্যতম। "প্রসবের ৩য় ধাপের সক্রিয় ব্যবস্থাপনা" (ছক দ্রষ্টব্য) রক্তক্ষরণের ঝুঁকি অনেকটাই কমাতে সাহায্য করে। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা সহ আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মতে যদি প্রসবের ৩য় ধাপের সক্রিয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করার মত দক্ষ ধাত্রী উপস্থিত না থাকে তবে একজন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী অক্সিটোসিন (১০ আই ইউ) অথবা মিসোপ্রোস্টোল (৪০০-৬০০ মাইক্রোগ্রাম মুখে) দিতে পারে। তবে অন্যান্য ওষুধের চেয়ে অক্সিটোসিন এক্ষেত্রে অধিক পছন্দনীয়।

অন্যান্য যে ব্যবস্থাগুলো এর পাশাপাশি নেয়া যায় তা হলো-

১. **প্রসব পূর্ব অবস্থায় :** কোন জটিলতা আছে কিনা এবং থাকলে তার চিকিৎসা করা, বাচ্চার জন্মদানের ব্যাপারে আগে থেকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা যাতে একজন দক্ষ ধাত্রী বা চিকিৎসক পাওয়া যায়।

২. **প্রসবের সময় :** পার্টোগ্রাফ (Patrograph) নিশ্চিত করা, মায়ের যাতে প্রস্রাবের থলি খালি থাকে সেটা খেয়াল রাখা, কৃত্রিম ভাবে প্রসবের সূচনা যতটা সম্ভব কম করা, জরায়ুমুখ পুরোপুরি প্রসারিত হবার আগে চাপ দিতে উৎসাহ না দেয়া, বাচ্চা তাড়াতাড়ি বের করার জন্য জরায়ুতে বাইরে থেকে চাপ না দেয়া, দরকার না পড়লে যোনিদ্বার না কাটা, বাচ্চার মাথা ও কাঁধ যাতে ভালমত বের হতে পারে সেভাবে মাকে সাহায্য করা।

৩. **প্রসবের ৩য় ধাপে :** সক্রিয় ব্যবস্থাপনা (সব চেয়ে বেশি কার্যকর পদ্ধতি), গর্ভফুল বের হবার আগে কখনোই জরায়ু মালিশ না করা, গর্ভফুল বের করার জন্য জরায়ুতে চাপ না দেয়া, অক্সিটোসিন না দিয়ে গর্ভফুলের নালী বের করার চেষ্টা না করা, গর্ভফুল বের করার সময় এক হাত দিয়ে জরায়ুকে চাপ দিয়ে রাখা।

৪. **গর্ভফুল বের হবার পর :** জরায়ুমুখ, যোনি, যোনিদ্বার, পায়ুপথ পরীক্ষা করা যে কোন ক্ষত হয়েছে কি না, গর্ভফুল সম্পূর্ণ বের হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা, জরায়ু ঠিকমত সংকুচিত হয়েছে কি না তা লক্ষ করা, নির্দিষ্ট সময় পর পর জরায়ু মালিশ করা যাতে ভালমতন সংকোচন হয় এবং দৃঢ় থাকে (অন্তত পক্ষে প্রসবের পর প্রথম ২ ঘন্টা প্রতি ১৫ মিনিট পর পর), মাকে নিজের জরায়ু দৃঢ় রাখার জন্য মালিশ করার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া। প্রসবের পরবর্তী ২ ঘন্টা যোনি পথে রক্তপাত হচ্ছে কি না বা জরায়ু দৃঢ় আছে কি না বার বার দেখা, প্রসবের পর পর সময়কালে মায়ের প্রস্রাবের থলি খালি রাখা।

প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ বাচ্চা জন্মদানের একটি প্রচলিত সমস্যা এবং মাতৃমৃত্যু ও মায়ের স্বাস্থ্য ঝুঁকির অন্যতম প্রধান কারণ। চিকিৎসকের উচিত প্রসবের আগে এবং প্রসবের সময় ঝুঁকি চিহ্নিত করে আগে থেকে পরিকল্পনা নেওয়া। তবে কোন রকম আগাম ঝুঁকি ও আভাস ছাড়াই প্রসবের পরে রক্তক্ষরণ শুরু হতে পারে। আদর্শগত ভাবে সমস্ত প্রতিষ্ঠান যেখানে বাচ্চা জন্মদান করানো হয়, সেখানে প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণের প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

উচ্চ রক্তচাপ

ধমনীতে সিস্টোলিক রক্তচাপ যদি ১৪০ মি.মি. মার্কারি অথবা বেশী এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ যদি ৯০ মি.মি. মার্কারি অথবা তার বেশী থাকে অথবা উচ্চ রক্তচাপ নিরোধক ব্যবস্থা নেওয়া সত্বেও বেশী থাকলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে। উচ্চরক্তচাপ রক্ত পরিবহন তন্ত্রের সর্বাধিক সাধারণ একটি সমস্যা।

প্রকার ভেদ ঃ

ক) এ্যাসেনসিয়াল হাইপারটেনশন: শতকরা ৯৫ ভাগ এই উচ্চরক্ত চাপের অন্তর্ভূক্ত, যার কারণ অজানা।

খ) সেকেন্ডারী হাইপারটেনশন: যা দেহের অন্য রোগের কারণে হতে পারে। যেমন-

- ❒ অতিরিক্ত এ্যালকোহল সেবন
- ❒ অতিরিক্ত মেদ (Obesity)
- ❒ গর্ভ কালীন/গর্ভ পরবর্তী খিচুনী
- ❒ রেনাল ভাসকুলার ডিজিজ
- ❒ রেনাল প্যারেনকাইমাল ডিজিজ
- ❒ গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটাইটিস
- ❒ পলিসিসটিক কিডনীর রোগ
- ❒ অ্যানডোক্রাইন রোগ :
  - ফিওক্রোমোসাইটোমা
  - প্রাইমারী হাইপারএল্ডোসটেরনিজম/কনস সিনড্রোম
  - হাইপার প্যারাথাইরায়ডিজম
  - এক্রোমেগালী
  - প্রাইমারী হাইপোথাইরয়ডিজম
  - থাইরোটক্সিকোসিস
  - কনজেনিটাল এ্যডরেনাল হাইপারপ্লেসিয়া
- ❒ ওষুধ ঃ কিছু ওষুধ ব্যবহারে রক্ত চাপ অস্বাভাবিক ভাবে বাড়তে পারে। যেমন-
  - জন্মনিরোধক বড়ি
  - বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপক ওষুধ
  - ব্যথানাশক ওষুধ
  - অন্যান্য ওষুধ (Others)
- ❒ মহাধমনীতে রোগ

উচ্চ রক্তচাপের সম্ভাব্য কারণ ঃ

- ❒ বেশী বয়স
- ❒ লিঙ্গ পুরুষ এবং ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলাদের বেশী হয়
- ❒ পরিবারে হৃদরোগের ইতিহাস
- ❒ খাদ্য ঃ অতিরিক্ত তেল জাতীয় খাবার খাওয়া, ফল-মূল কম খাওয়া।
- ❒ ধূমপান ও নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ (অতিরিক্ত মদ্যপান)
- ❒ ডায়াবেটিস
- ❒ রক্তে চর্বির আধিক্য

রক্তচাপের শ্রেণিবিভাগ ঃ

ক্যাটাগরি	সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার (মিঃমিঃমার্কারি)	ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার (মিঃমিঃমার্কারি)
ব্লাড প্রেসার		
অপটিমাল	< ১২০	< ৮০
নরমাল	< ১৩০	< ৮৫
হাই নরমাল	১৩০ - ১৩৯	৮৫ - ৮৯
হাইপারটেনশন		
গ্রেড ১ (মাইল্ড)	১৪০ - ১৫৯	৯০ - ৯৯
গ্রেড ২ (মডারেট)	১৬০ - ১৭৯	১০০ - ১০৯
গ্রেড ৩ (সিভিয়ার)	≥ ১৮০	≥ ১১০
আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশন		
গ্রেড ১	১৪০ -১৫৯	< ৯০

রক্তচাপ পরিমাপ ঃ

রক্তচাপ পরিমাপের জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করা উচিত। যেমন ঃ

- ❒ রোগীকে অন্তত ৫ মিনিট আরামদায়ক ভাবে চেয়ারে বসাতে হবে। পায়ের পাতা যেন মেঝেতে থাকে এবং হাতের বাহু যেন হৃদপিন্ড বরাবর থাকে
- ❒ যথাযথ মাপের কাফ ব্যবহার করতে হবে

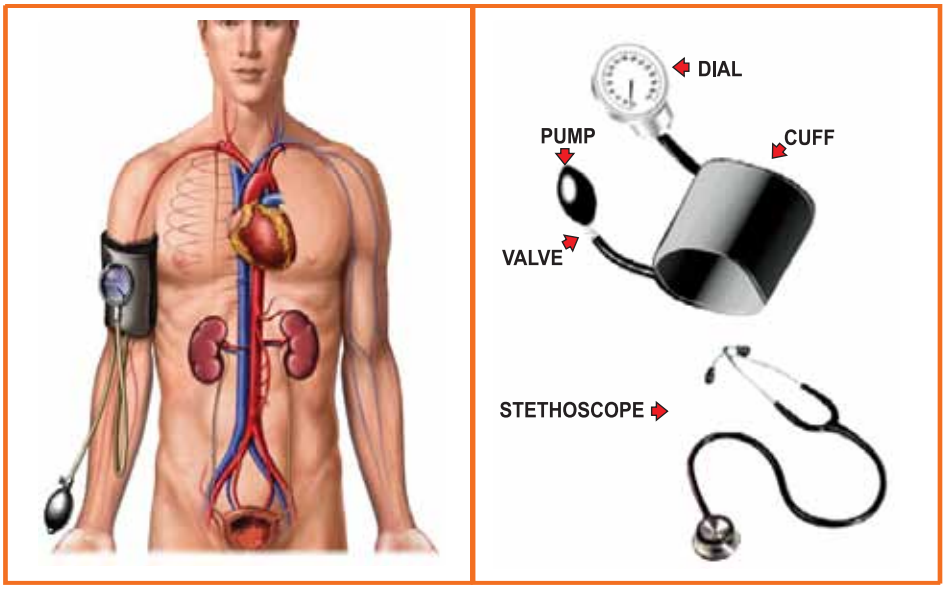

- ❒ কমপক্ষে ২ বার রক্তচাপ পরিমাপ করতে হবে
- ❒ রক্তচাপ সবসময় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে: কর্মরত অবস্থায় এবং বিশ্রামের সময়
- ❒ রক্তচাপ বৃদ্ধির সাথে শরীরের বিশেষ অঙ্গগুলো ঠিক আছে কিনা খেয়াল রাখতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপ

উপসর্গ ও লক্ষণ ঃ

- প্রাথমিকভাবে উচ্চ রক্তচাপের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না বেশীর ভাগ মানুষ বুঝতে পারে না তার উচ্চ চাপ আছে। অনেক সময় বিভিন্ন দুর্ঘটনাজনিত কারণে রক্তচাপ পরিমাপের সময় এটা জানা যায়
- মাথা ব্যথা
- সকালে মাথা ব্যথা
- কানে শোঁ-শোঁ শব্দ হওয়া
- ঝিম ঝিম ভাব

জীবন যাপনের নিয়ম পরিবর্তনের মাধ্যমে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করা যায়।

- ওজন বেশী হলে তা কমানো
- শারীরিক পরিশ্রম বেশী করা
- ধূমপান ও মদ্যপান বন্ধ করা
- তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করা
- ফল ও শাক-সবজী খাওয়া
- লবণ কম খাওয়া
- দুশ্চিন্তা দূর করা

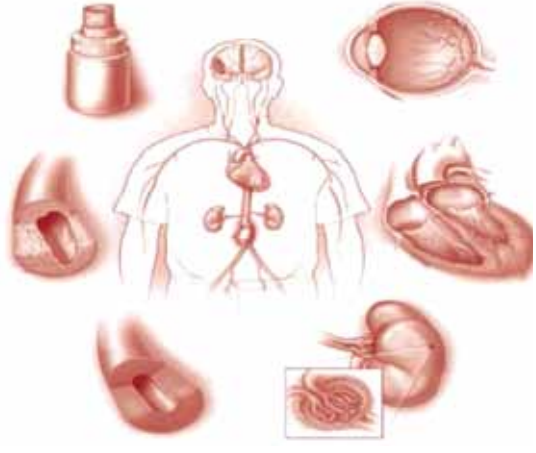

উচ্চ রক্তচাপে সম্ভাব্য আক্রান্ত অঙ্গসমূহ

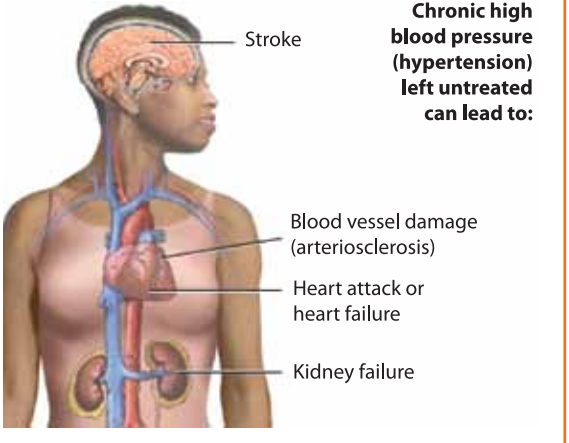

- সিদ্ধান্তহীনতা
- চোখে ঝাপসা দেখা
- বমি বমি ভাব
- অস্থিরতা
- নাক দিয়া রক্ত পড়া
- বুক ধড়-ফড় করা
- চামড়া ফ্যাকাসে হওয়া

উচ্চ রক্তচাপজনিত পরীক্ষাঃ

- রক্তে সুগারের মাত্রা (Blood Glucose)
- মূত্র পরীক্ষা (Urine Analysis)
- ই.সি.জি. (ECG)
- সিরাম ক্রিয়েটিনিন (S. Creatinine)
- সিরাম পটাসিয়াম (S. Potassium)
- রক্তে চর্বির পরিমান (Lipid Profile)

চিকিৎসা ঃ

চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের পঙ্গুত্ব ও মৃত্যুর হার কমানো (কিডনী, হৃদপিন্ড ও মস্তিষ্ক কে উচ্চ রক্তচাপ হতে রক্ষা করার মাধ্যমে)।

ওষুধ ঃ

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবনীয়।

জটিলতা ঃ

অনেক দিন ধরে উচ্চ রক্তচাপ থাকা সত্বেও চিকিৎসা না নিলে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো হতে পারে।

- ষ্ট্রোক
- রক্তের নালী বন্ধ হয়ে বা অকেজো হয়ে যাওয়া
- হৃদরোগ অথবা হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া
- কিডনীর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়া
- অন্ধত্ব

উচ্চ রক্তচাপ হলো পঙ্গুত্ব ও মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। সুতরাং এটাকে অবশ্যই চিকিৎসার আওতায় আনতে হবে। যদিও উচ্চ রক্তচাপ একটা স্বাভাবিক রোগ একারণেই এটা সম্পর্কে মানুষ সচেতন নয় এবং চিকিৎসার আওতায় থাকে না। তবে এই রোগ সহজে নির্ণয় করা যায় এবং চিকিৎসা করা যায়।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

শিশুদের ডায়রিয়া

বিশ্বে শিশুমৃত্যু এবং শিশুর অসুস্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ডায়রিয়া জনিত অসুখ। যার বিস্তারের কারণ প্রধানত দূষিত খাবার এবং পানি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে সারা বিশ্বে প্রায় ৭৮ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ খাবার পানি থেকে এবং ২৫ কোটি মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

সেইসাথে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত ডায়রিয়ার প্রকোপ বেশি। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তিন বছরের কম বয়সী শিশুরা প্রতি বছর গড়ে তিনবার ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়। প্রতিবার তারা বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে ডায়রিয়া শিশুদের অপুষ্টিরও একটি প্রধান কারণ। আবার এই অপুষ্ট শিশুরাই বেশি বেশি ডায়রিয়াতে আক্রান্ত হয়।

সংজ্ঞা ঃ

শিশুর বয়স এবং খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের সাথে সাথে সে দিনে কতবার পায়খানা করবে এবং মলের কাঠিন্য কেমন হবে এগুলো পরিবর্তিত হয়। ডায়রিয়ার সংজ্ঞাও এর উপর নির্ভর করে।

কতবার ঃ

কম বয়সী শিশুর ক্ষেত্রে দিনে ৩-১০ বার পায়খানা হতে পারে। যদিও এই সংখ্যা শিশুর খাবার উপাদানের উপর নির্ভরশীল। যেসব শিশু বুকের দুধ পান করে তারা কৌটার দুধ পানকারী শিশুদের তুলনায় বেশিবার পায়খানা করে। এদের ক্ষেত্রে দিনে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বা প্রায় দ্বিগুন সংখ্যকবার পায়খানা করলে সেটাকে ডায়রিয়া বলা যায়।

একটু বেশি বয়সের শিশুরা সাধারণত দিনে ১-২ বার পায়খানা করে। এদের ক্ষেত্রে দিনে ৩ বার বা তার বেশি পাতলা পায়খানা হলে ডায়রিয়া ধরা যাবে। তবে মল শক্ত থাকলে সেটা ডায়রিয়া হবে না।

মলের কাঠিন্য এবং রঙ ঃ

মলের কাঠিন্য এবং রঙ শিশুর বয়সের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। বুকের দুধ পানকারী বাচ্চাদের মল সাধারণত নরম হয়। রঙ হয় হলুদ, সবুজ বা বাদামী। সব বয়সী বাচ্চাদের জন্যই খাবারের উপাদানের উপর এটা অনেকাংশে নির্ভরশীল। তবে বার বার পাতলা পায়খানা হলে বা তাতে মিউকাস (আম) থাকলে সেটা অবশ্যই সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে। যদি পায়খানা কাল হয় অথবা এর সাথে রক্ত দেখা যায় তাহলে দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

স্থায়িত্ব ঃ

ক্ষণস্থায়ী তীব্র ডায়রিয়া সাধারণত কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন স্থায়ী হয়। তবে ১৪ দিনের বেশি হলে সেটা দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া এবং এর চিকিৎসা ভিন্ন।

ক্ষণস্থায়ী তীব্র ডায়রিয়ার কারণ ঃ

এই ধরণের ডায়রিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাস জনিত সংক্রমণ থেকে হয়। এছাড়াও নানা কারণে তা হতে পারে। যেমনঃ

১. অন্ত্রের সংক্রমণ (গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস)ঃ ভাইরাস জনিত (প্রধানত রোটা ভাইরাস), ব্যাক্টেরিয়া জনিত (সালমোনেলা, শিজেলা) বা পরজীবি জনিত (জিয়ার্ডিয়া)।
২. খাবারজনিতঃ কোন বিশেষ খাবারে (দুধ বা দুগ্ধজাত) অ্যালার্জি বা হজম করতে না পারা।
৩. অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার জনিত।
৪. অন্ত্রের প্রদাহজনিত সমস্যাঃ ক্রনস ডিজিজ ও আলসারেটিভ কোলাইটিস।
৫. বিভিন্ন ধরণের সংক্রমণঃ কানপাকা, নিউমোনিয়া, মূত্রনালীর সংক্রমণ, মেনিনজাইটিস ইত্যাদি।

ডায়রিয়ায় পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়ার কারণ ঃ

এই ধরণের ঘটনা ঘটে সাধারণত যদি ব্যাক্টেরিয়া জনিত ডায়রিয়া হয়।

এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রচলিত কারণগুলোর মধ্যে আছে ১. পেটের নানা সংক্রমণ এবং ২. প্রদাহ (মায়ের দুধ বা গরুর দুধ থেকে সৃষ্ট)।

এক বছর বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে প্রচলি কারণগুলোর মধ্যে আছে ১. পেটের নানা সংক্রমণ, ২. অন্ত্রের প্রদাহজনিত সমস্যা এবং ৩. বাচ্চাদের পলিপ।

দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়ার কারণ ঃ

দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ডায়রিয়া এবং সেইসাথে ওজন কমে গেলে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অসুখ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দরকার।

কী কী হতে পারে

ক্ষেত্র ১. সুস্থ শিশু এবং ওজন না কমলেঃ

ক) শৈশবের ডায়রিয়াঃ অনেক শিশুর দুই বছর বয়স থেকে ডায়রিয়ার মত লক্ষণ দেখা দেয় যা সাধারণত চার বছর বয়সে ভাল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বৃদ্ধি বা বিকাশে কোন বাধা পরিলক্ষিত হয় না।

খ) বুকের দুধ জনিত ডায়রিয়াঃ অনেক শিশু বুকের দুধ খাওয়া অবস্থায় অস্বাভাবিক পায়খানা করে। যদি আর কোন সমস্যা না থাকে এবং বৃদ্ধি বা বিকাশ স্বাভাবিক থাকে তাহলে এটা নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই।

ক্ষেত্র ২. অসুস্থ শিশু এবং ওজন কমলেঃ

ক) খাবার হজমে সমস্যাঃ যেমন- গরুর দুধ।
খ) অন্ত্রের প্রদাহজনিত সমস্যাঃ ক্রনস ডিজিজ ও আলসারেটিভ কোলাইটিস।
গ) পরজীবিঃ যেমন-জিয়ার্ডিয়া
ঘ) অন্ত্রের কিছু রোগ যেমন- সিলিয়াক ডিজিজ, অগ্নাশয়ের এনজাইমের স্বল্পতা, জন্মগতভাবে হজমে সমস্যা ইত্যাদি।
ঙ) ওষুধজনিতঃ অনেক সময় বেশি বেশি ল্যাকজেটিভ জাতীয় ওষুধের (ল্যাক্টুলোজ, প্যারাফিন) ব্যবহার।

লক্ষণ ও উপসর্গ ঃ

রোগ সম্বন্ধে জানার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল কত দিন ধরে এবং দিনে কত বার পায়খানা হচ্ছে, সাথে জ্বর, বমি, পেট ব্যথা আছে কি না এবং পায়খানার সাথে রক্ত যাচ্ছে কি না। শিশু এখন বা নিকট অতীতে (২ মাসের মধ্যে) কোন অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছে কি না এটাও জানা জরুরী।

শিশু কখনো কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগলে সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। একই সাথে অল্প কয়েকদিনের ভেতর কোথাও বেড়োতে গিয়েছিল কি না, কোন দূষিত খাবার বা পানি পান করেছিল কি না এবং আশে পাশে আর কারও ডায়রিয়ার সমস্যা আছে কি না এগুলোর ব্যাপারেও খোঁজ নিতে হবে।

শিশুর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের সময় ডায়রিয়া জনিত সমস্যার দিকে মনযোগ দিতে হবে। ওজন কমে যাওয়া, তরল জাতীয় খাবার বা পানি কম খাওয়া, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া এগুলো পানিশূন্যতা নির্দেশ করে।

জানামতে শিশুর বা তার পরিবারের অন্য কারও পেটের সমস্যা আছে কিনা এটাও জিজ্ঞাসা করা জরুরী।

সাধারণত যে উপসর্গগুলো পাওয়া যায় তা হলোঃ

১. পানিশূন্যতাঃ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের অসুস্থতা এবং মৃত্যুর প্রধান কারণ হলো পনিশূন্যতা। গুরুতর পানিশূন্যতার লক্ষণগুলো হলো শিশু নিস্তেজ হয়ে পড়বে বা অজ্ঞান হয়ে যাবে, চোখ বসে যাবে, ঠিক মত পানি পান করবে না বা করতে পারবে না, চামড়া টেনে ধরলে খুবই আস্তে আস্তে আগের জায়গায় ফিরে যাবে। অল্প পানিশূন্যতার লক্ষণ হলো শিশু খুব ছট ফট করবে, চোখ বসে যাবে, খুব আগ্রহ নিয়ে পানি পান করবে, তৃষ্ণার্ত মনে হবে, চামড়া টেনে ধরলে কিছুটা আস্তে আগের জায়গায় ফিরে যাবে।

২. জ্বর

৩. বমি হওয়া বা বমিবমি ভাব

৪. পেট ব্যথা বা ফাঁপা

৫. ওজন কমে যাওয়া

বিপদজনক কিছু চিহ্ন ঃ

১. নাড়ির গতি বেড়ে যাওয়া, রক্তচাপ কমে যাওয়া, খুব বেশি নিস্তেজ হয়ে পড়া

২. পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া

৩. পিত্ত সহ বমি হওয়া

৪. পেটে তীব্র ব্যথা বা খুব বেশি ফুলে যাওয়া

৫. গায়ে লাল লাল দাগ বের হওয়া অথবা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া

শারীরিক পরীক্ষা ঃ

পানিশূন্যতা বা জ্বর আছে কিনা এটা ভাল করে খেয়াল করতে হবে।

হাত-পায়ের চামড়া কুচকে গেছে কিনা বা র‍্যাশ জাতীয় কিছু বের হয়েছে কি না দেখতে হবে। পেটে খুব ব্যথা বা পেট বেশি ফুলে গেছে কি না লক্ষ্য করতে হবে। পায়খানার রাস্তার আশেপাশে কোন ঘা আছে কি না দেখতে হবে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঃ

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডায়রিয়ার ধরণ হলো ক্ষণস্থায়ী তীব্র ডায়রিয়া যার জন্য বিশেষ কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার নেই। তবে ভাইরাসজনিত ছাড়া অন্য কোন কারণে ডায়রিয়া সন্দেহ করলে নিম্নোক্ত পরীক্ষা- নিরীক্ষাগুলো করা যেতে পারেঃ

১. মল পরীক্ষা

২. রক্ত পরীক্ষা

৩. এন্ডোস্কোপি

৪. ক্ষেত্রে বিশেষ টিস্যু বায়োপসি

রোটা ভাইরাস জনিত পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার

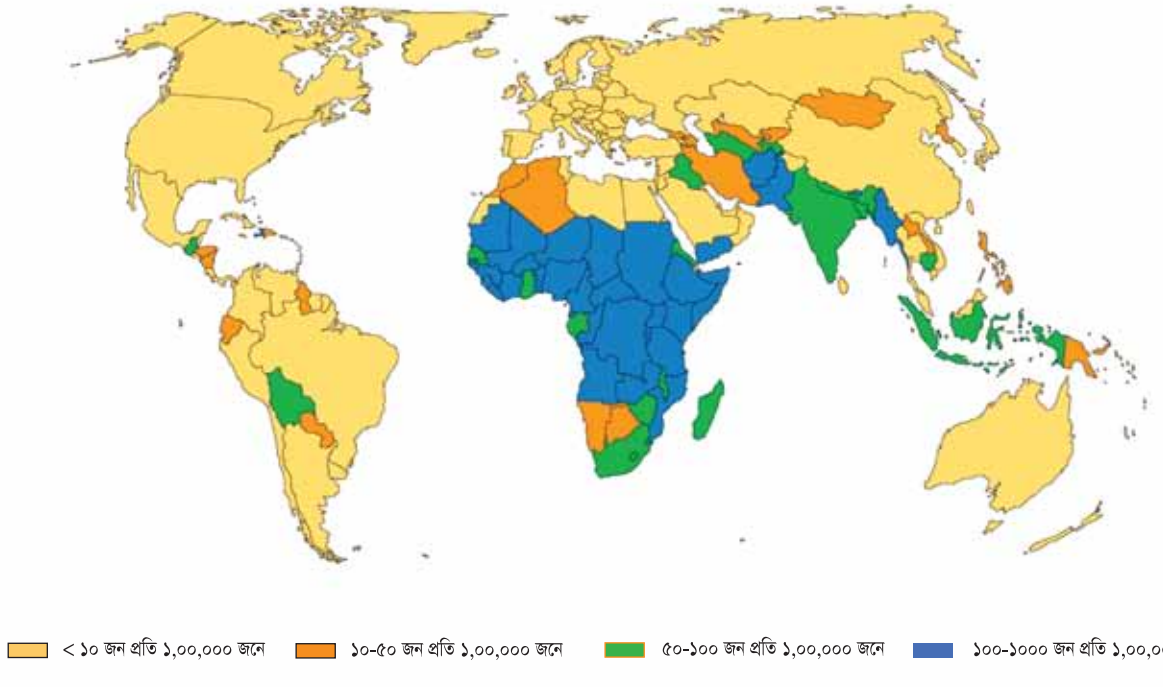

চিকিৎসা ঃ

সাধারণ চিকিৎসার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিশুকে বারে বারে তরল খাবার খাওয়ানো। খুব গুরুতর পানিশূন্যতার ক্ষেত্রে শিরায় স্যালাইন দিতে হতে পারে।

পানিশূন্যতা দূরীকরণ ঃ

মুখে খাবার স্যালাইন (ওআরএস) যা হাতের কাছে যেকোন ফার্মেসিতেই পাওয়া যায় এক্ষত্রে সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ। যতবার শিশু খেতে চাইবে ততবার দেয়া যাবে। কিছুক্ষণ পর পর শিশুকে পরীক্ষা করে তার পানিশূন্যতার লক্ষণগুলো আছে কিনা দেখতে হবে। থাকলে আবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

জিংক ট্যাবলেট ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা মুখে স্যালাইন খাবার পাশাপাশি জিংক ট্যাবলেট খাওয়ানোকে গুরুত্ব দিয়েছে। এক্ষেত্রে সুপারিশকৃত মাত্রা হলো ছয় বছরের নিচের শিশুদের জন্য দিনে ১০ মিলিগ্রাম এবং ছয় বছরে বেশি বয়সীদের জন্য দিনে ২০ মিলিগ্রাম। এভাবে ১০-১৪ দিন খাওয়াতে হবে। ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের জন্য জিংক খুবই উপকারী কারণ এটি শরীরে প্রোটিন তৈরি, কোষের বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো সহ পানি ও অন্যান্য খনিজ লবণের বাহন হিসেবেও কাজ করে।

খাদ্য ও পুষ্টি ঃ

যেসব শিশুর পানিশূন্যতা নেই তারা স্বাভাবিক খাবার খাবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না। পানিশূন্যতায় আক্রান্ত শিশুদের আগে পানিশূন্যতা দূর করতে হবে। এর জন্য মুখে খাবার স্যালাইনই সবচেয়ে উপযুক্ত। তারপর তারা স্বাভাবিক খাবার খেতে পারবে।

দীর্ঘস্থায়ী শৈশবের ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে চর্বি ও আঁশ জাতীয় খাবারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। তরলের (বিশেষ করে ফলের রস) পরিমাণ কমাতে হবে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে- যেগুলো চর্বিতে দ্রবণীয়।

যেসব শিশুরা স্বাভাবিক খাবার খেতে পারে তাদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট পরামর্শ মেনে চলা যেতে পারে। যেমন-

১. দুধে অ্যালার্জি জনিত সমস্যা না থাকলে গরুর দুধ বাদ দেবার বা তাতে পানি মেশানোর দরকার নেই।

২. খাদ্যতালিকায় জটিল শর্করা (যেমন ভাত, রুটি, আলু), কম চর্বিযুক্ত মাংস, দই, ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদি থাকা উচিত। বেশি মাত্রায় চর্বিযুক্ত খাবার হজমে অসুবিধা হয়। তাই এই ধরণের খাবার এড়িয়ে চলা ভাল।

৩. শিশুদের খাদ্যতালিকা অযথা পরিষ্কার তরল জাতীয় খাবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উচিত না। এতে ঠিকমত পুষ্টি উপাদান পেতে সমস্যা হতে পারে। এমনকি বেশিদিন শুধু পরিষ্কার তরল জাতীয় খাবার দিলে সেটা আবার নতুন করে দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া তৈরি করতে পারে।

৪. বিভিন্ন ফলের রস যাতে উচ্চ মাত্রায় চিনি থাকে সেগুলো এড়িয়ে চলা ভাল। কোমল পানীয়ও বাদ দিতে হবে। কারণ এসবের ভেতর অনেক বেশি চিনি এবং বেমানান ভাবে খনিজ লবণ থাকে যা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুর জন্য অনুপযুক্ত। বরং ফার্মেসিতে যে মুখে খাবার স্যালাইন পাওয়া যায় এক্ষেত্রে সেটাই সবচেয়ে ভাল।

ওষুধ ঃ

সাধরণত অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিডায়রিয়াল যে ওষুধগুলো আছে সেগুলো শিশুদের ক্ষেত্রে লাগে না। বরং কখনো কখনো তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভাইরাসজনিত ডায়রিয়াতে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সবসময়েই অযৌক্তিক। এতে ডায়রিয়া ভাল তো হবেই না বরং এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এবং অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকরিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে যদি দরকার হয় তবে মল ও রক্ত পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া সনাক্ত করে তারপর অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যেতে পারে।

অ্যান্টিডায়রিয়াল ওষুধ (যেমন লোপেরামাইড) শিশুদের দেয়া উচিত নয় কারণ এতে ঝুঁকি অনেক বেশি। অনেক সময় লক্ষণ ঢাকা পড়ে চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হতে পারে।

শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে যদি-

১. রোগ নির্ণয় নিয়ে কোন সন্দেহ থাকে

২. পানিশূন্যতার কোন লক্ষণ থাকে, বিশেষ করে বাচ্চার বয়স ৬ মাসের কম হলে

৩. মুখে খাবার স্যালাইন দেবার মত পরিস্থিতি না থাকলে (যেমন- বমি)

৪. আগে থেকেই শিশুর এমন কোন রোগ থাকে যা ডায়রিয়ার জন্য আরও খারাপ হতে পারে (যেমন- ডায়াবেটিস)

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার মতে ডায়রিয়া প্রতিরোধের কার্যকর উপায়গুলো হল-

১. নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করা

২. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা

৩. সাবান দিয়ে নিয়মমত হাত ধোয়া

৪. জন্মের পর প্রথম ছয়মাস শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো

৫. ব্যক্তিগত এবং খাবারের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

৬. কীভাবে সংক্রমণ ছড়ায় তা সবাইকে শেখানো

৭. সর্বোপরি সম্ভব হলে রোটা ভাইরাসের ভ্যাক্সিন দেয়া

বিশ্বে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডায়রিয়া দ্বিতীয়। প্রতিবছর প্রায় ৭ লক্ষ ৬০ হাজার শিশু এর ফলে মারা যায়। এটা পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের অপুষ্টিরও প্রধান কারণ। অথচ শুধুমাত্র নিরাপদ খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলে ডায়রিয়া অনেকটাই প্রতিরোধ করা যায়।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

ক্যালবোরাল-ডি

ক্যালসিয়াম কার্বনেট ইউএসপি (কোরাল থেকে উৎপাদিত) ও ভিটামিন- ডি ইউএসপি

উপাদান

প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট (কোরাল থেকে উৎপাদিত) ইউএসপি ১২৫০ মি.গ্রা. যা ৫০০ মি.গ্রা. মৌলিক ক্যালসিয়ামের সমতুল্য ও ভিটামিন- ডি ২০০ আই ইউ (কোলিক্যালসিফেরল হিসেবে)।

ফার্মাকোলজি

রক্তের পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য। শরীরের জৈব রসায়ন রক্তে ক্যালসিয়ামের নিম্ন মাত্রা অতি অল্প সময়ের জন্যও সহ্য করে না। ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় দেখা যায় ক্যালসিয়াম হাড়ের ক্ষয় ও ক্ষয়জনিত ভাঙ্গন প্রতিরোধ করে। ভিটামিন-ডি সুস্থ হাড়ের জন্য অত্যাবশ্যকীয়, এছাড়াও ইহা ক্যালসিয়ামের শোষণ বৃদ্ধি করে এবং ইহা হাড়ের গঠনকে ত্বরান্বিত করে। ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন-ডি এর হাড়ের বৃদ্ধিতে তথা হাড়ের ক্ষয় ও ক্ষয়জনিত ভাঙ্গন প্রতিরোধে সিনারজিস্টিক প্রভাব আছে। ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি অস্টিওপোরোসিস এবং হাড়ের ভাঙ্গন রোধে ব্যবহৃত হয়।

নির্দেশনা

ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন- ডি নিম্নলিখিত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়-

- অষ্টিওপোরোসিস
- অষ্টিওমেলাসিয়া
- রিকেট্স
- টিটানিতে
- প্যারাথাইরয়েড রোগসমূহে

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

১টি ট্যাবলেট দিনে ২ বার, সকালে এবং রাতে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

প্রতিনির্দেশনা

- হাইপারক্যালসিমিয়া এবং হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম
- হাইপারক্যালসিউরিয়া এবং নেফ্রোলিথিয়াসিস
- অতিসংবেদনশীলতা
- বৃক্কের অকার্যকারিতা
- ডিগক্সিন এর সাথে ব্যবহার (রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হয়)

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

মৌখিক ক্যালসিয়াম কার্বনেট পাকস্থলী ও অন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। এককভাবে ক্যালসিয়াম সেবন করলে রক্তে ক্যালসিয়াম উচ্চমাত্রা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। ভিটামিন-ডি সেবনের পরে সাধারণত খুব অল্প সংখ্যক রোগীর ত্বক লালচে হয়ে যায়।

সতর্কতা ও সাবধানতা

মৃদু হাইপারক্যালসিউরিয়া (নিঃসরণ মাত্রা সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট এর মাত্রা কমাতে হবে বা চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে)। যে সকল রোগীর ক্ষেত্রে পাথর সৃষ্টির ইতিহাস জানা গিয়েছে তাদেরকে তরল খাদ্য গ্রহণ বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ দেওয়া উচিৎ।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

ডিগক্সিন, এন্টাসিড, ক্যালসিয়াম বা এলুমিনিয়ামযুক্ত এন্টাসিড, ক্যালসিট্রিয়োল, টেট্রাসাইক্লিন, ডক্সিসাইক্লিন, এমাইনোসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি। তাই উপরোক্ত ওষুধের সাথে ক্যালবোরাল-ডি ট্যাবলেট সেবনের সময় অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিৎ।

গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার

উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের পরামর্শে সেব্য।

মাত্রাধিক্য

বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়া, প্রচন্ড তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মুখ শুষ্ক হওয়া, ক্ষুধামন্দা, ধাতব স্বাদ, পাকস্থলীতে মোচড়ানো, ডায়রিয়া, দুর্বলতা, মাথাব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং মাথা ঝিম ঝিম করা ইত্যাদি।

সংরক্ষণ

আলো থেকে দূরে, ৩০°সে. তাপমাত্রার নিচে রাখুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ৩০ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

রিনর্মা

টিবোলন

উপাদান

প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে টিবোলন ২.৫ মি.গ্রা. আইএনএন।

ফার্মাকোলজি

টিবোলন ইস্ট্রোজেন, এ্যান্ড্রোজেন এবং প্রোজেস্টাজেনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি সিনথেটিক স্টেরয়েড। মুখে সেবনের পর ইহা খুব দ্রুত এর তিনটি কার্যকরী উপাদানে বিভক্ত হয়। এদের মধ্যে দুটো মেটাবোলাইটে প্রোজেস্টাজেনিক কার্যকারিতা রয়েছে। টিবোলন মেনোপোজ পরবর্তী মহিলাদের ইস্ট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণসমূহ দূর করে। ইহা মেনোপোজ এবং ওভারেকটোমি পরবর্তী হাড়ক্ষয় প্রতিরোধ করে। হাড় এবং শরীরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের ওপর ইহার ইস্ট্রোজেনজনিত কার্যকারিতা আছে। যোনীপথের শুষ্কতা এবং অ্যাট্রাফিতে ইহা কার্যকরী। আবেগ এবং যৌনানুভূতির ওপরও ইহার ভূমিকা আছে।

নির্দেশনা

- স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম মেনোপোজের লক্ষণসমূহের চিকিৎসা
- মেনোপোজ পরবর্তী অস্টিওপোরোসিস এবং হাড়ক্ষয়ের ঝুঁকি আছে এমন রোগী যদি অস্থিক্ষয় প্রতিরোধক অন্যান্য ওষুধ সেবনে অপারগ হয়

কয়েকটি ওষুধের ব্যবহার ও বিধিনিষেধ

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম মেনোপোজের লক্ষণসমূহের চিকিৎসায় প্রতিদিন ২.৫ মি.গ্রা.।

মেনোপোজ পরবর্তী অস্থিক্ষয় রোধে: অনুমোদিত মাত্রা: ২.৫ মি.গ্রা. প্রতিদিন।

প্রতিদিন একই সময়ে ওষুধ সেবন প্রযোজ্য।

ওষুধ শুরু করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই লক্ষণসমূহের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য সম্পূর্ণ সুফল পেতে হলে অন্তত ৩ মাসব্যাপী ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে। চিকিৎসার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্বল্পতম সময়ের জন্য টিবোলন সেব্য। ছয় মাসের অধিক সময়ব্যাপী চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সুফল ও ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনাপূর্বক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

টিবোলন আরম্ভ করার সময় লক্ষণীয়

স্বাভাবিক মেনোপোজ হয়েছে এমন মহিলাদের ক্ষেত্রে শেষবার মাসিকের অন্তত ১২ মাস পর টিবোলন শুরু করতে হবে। সার্জারিজনিত মেনোপোজের ক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব টিবোলন শুরু করতে হবে।

কম্বাইন্ড অথবা শুধুমাত্র ইস্ট্রোজেন নির্ভর এইচ আর টি হতে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে -

শুধুমাত্র ইস্ট্রোজেন পিল হতে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একবার উইথড্রয়াল ব্লিডিং এর পর টিবোলন শুরু করতে হবে।

সিকোয়েন্সিয়াল এইচ আর টি হতে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রোজেস্টাজেন ফেইজ শেষ হবার পর টিবোলন শুরু করতে হবে।

কন্টিনিউয়াস কম্বাইন্ড এইচ আর টি হতে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেকোন সময় টিবোলন শুরু করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মাসিক হলে টিবোলন শুরুর পূর্বে এর যথাযথ কারণ নির্ণয় প্রয়োজন।

ট্যাবলেট সেবন বাদ পড়লে

১২ ঘন্টা অতিক্রম না করলে মনে পড়ার সাথে সাথে ওষুধ সেবন করতে হবে। অন্যথায় পরবর্তীতে পূর্বের মাত্রা যথানিয়মে চালিয়ে যেতে হবে।

প্রতি নির্দেশনা

- গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালীন সময়
- জ্ঞাত অথবা সন্দেহজনক স্তনের টিউমার
- জ্ঞাত অথবা সন্দেজনক ইস্ট্রোজেন নির্ভর ম্যালিগন্যান্ট টিউমার
- অনির্ণিত জেনিটাল ব্লিডিং
- এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাশিয়ার চিকিৎসা না করা হলে
- ইতিহাস আছে অথবা বর্তমান ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম
- যেকোন আর্টারিয়াল থ্রম্বোএম্বোলিক রোগের ইতিহাস থাকলে
- যকৃতের মারাত্মক রোগসমূহ
- পোর্ফাইরিয়া

সাবধানতা

- লিওমায়োমা
- থ্রম্বোএম্বোলিক ডিসঅর্ডারের ইতিহাস অথবা ঝুঁকি থাকলে
- ইস্ট্রোজেন নির্ভর টিউমারের ঝুঁকিসমূহের উপস্থিতি
- উচ্চ রক্তচাপ
- যকৃতের অসুখ
- ডায়াবেটিস মেলাইটাস
- কোলেলিথিয়াসিস
- মাইগ্রেন অথবা তীব্র মাথাব্যথা
- সিস্টেমিক লুপাস ইরাইথেম্যাটোসিস
- এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাশিয়ার ইতিহাস থাকলে
- মৃগীরোগ
- এ্যাজমা
- অস্টিওস্ক্লেরোসিস

যেসব ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে

- জন্ডিস অথবা যকৃতের কার্যকারিতার অবনতি
- রক্তচাপের অত্যধিক বৃদ্ধি
- মাইগ্রেন জাতীয় মাথাব্যথার উৎপত্তি

গর্ভাবস্থায় ব্যবহার

USFDA ক্যাটাগরি ডি।

স্তন্যদানকালে ব্যবহার

নির্দেশিত নয়।

অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া

রক্তের ফিব্রিনোলাইটিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করে বিধায় ইহা এ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট প্রভাবও বৃদ্ধি করে। তাই বিশেষতঃ ওয়ারফেরিনের সাথে এর একক ব্যবহার সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং ওয়ারফেরিনের মাত্রা সঠিকভাবে সমন্বয় করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

পরিপাকতন্ত্রের উপসর্গ যেমন পেটে ব্যথা, ত্বকের উপসর্গ যেমন- চুলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, ব্রন, প্রজননতন্ত্র এবং স্তনের উপসর্গ যেমন- স্রাব, এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারট্রফি, মেনোপোজ পরবর্তী মাসিক, স্তনের ব্যথা, জেনিটাল প্রুরাইটিস, যোনীপথে ছত্রাকের সংক্রমণ, সারভিক্যাল ডিসপ্লাসিয়া ইত্যাদি।

মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার

প্রাণিদেহে টিবোলনের বিষক্রিয়া খুবই সামান্য। তাই ক্রমাগত বেশ কিছু ট্যাবলেট সেবনের পরেও তেমন বিষক্রিয়ার সম্ভবনা নেই। মাত্রার অতিরিক্ত ব্যবহারে বমি বমি ভাব, বমি, উইথড্রয়াল ব্লিডিং ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। প্রয়োজনে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দেয়া যেতে পারে।

সংরক্ষণ

আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠাণ্ডা স্থানে রাখুন।

সরবরাহ

প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট।

ওরোস্টার প্লাস

উপাদান

প্রতি ১০০ মি.লি. মাউথওয়াশ-এ আছে ইউক্যালিপ্টল ইউএসপি ০.০৯২ গ্রাম, মেনথল ইউএসপি ০.০৪২ গ্রাম, মিথাইল স্যালিসাইলেট বিপি ০.০৬০ গ্রাম, থাইমল বিপি ০.০৬৪ গ্রাম এবং সোডিয়াম ফ্লোরাইড বিপি ০.০২০ গ্রাম।

ব্যবহার

- দন্তক্ষয় প্রতিরোধে সাহায্য করে
- এনামেল পূর্ণগঠন করে
- দাঁতকে শক্তিশালী করে
- মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে ধ্বংস করে
- প্লাক ও জিনজিভাইটিস প্রতিরোধ করে এবং কমায়

সতর্কতা

৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিন। মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ গলধঃকরণ করলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন অথবা নিকটস্থ হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।

নির্দেশনা

পূর্ণ শক্তির ১০ মি.লি. ওরোস্টার প্লাস এন্টিসেপটিক এবং এন্টিক্যাভিটি মাউথওয়াশ দিয়ে ১ মিনিট ধরে সকালে ও রাতে কুলকুচি করে ফেলে দিন।

অন্যান্য তথ্য

২৫° সে. তাপমাত্রার নিচে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

ওরোস্টার প্লাস: ১২০ মি.লি. ও ২৫০ মি.লি।

ইসপারগুল®

উপাদান

ইসপারগুল স্যাশে : প্রতিটি স্যাশেতে আছে ৩.৫ গ্রাম প্লান্টাগো ওভাটা (সিলিয়াম) হাস্ক।

ইসপারগুল কন্টেইনার : প্রতিটি কন্টেইনারে আছে ১২০ গ্রাম প্লান্টাগো ওভাটা (সিলিয়াম) হাস্ক।

বর্ণনা

প্লান্টাগো ওভাটা উদ্ভিদের খোসা ও বীজ কে সাধারণত সিলিয়াম বা ইসবগুল বলা হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য চিকিৎসায় সম্পূরক আশ হিসেবে ইসবগুল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

সক্রিয় উপাদান

ইসবগুল সহজে পানিতে জেল তৈরী করে বিধায় একে মিউসিলেজিনাস শ্রেনীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ইসবগুলের অন্তর্বীজ পানি ধরে রাখে বলে এটি শুস্ক হয় না এবং সহজেই জেল তৈরী করতে পারে।

ইসবগুলে থাকে -

হেমি সেলুলোজ

অ্যারাবিনোজ

র‍্যামনোজ

গ্যালাকটিউরনিক এসিড

৩৫% দ্রবনীয় ও ৬৫% অদ্রবনীয় পলি-স্যাকারাইড

কিভাবে কাজ করে

ইসবগুল খাওয়ার ৪ ঘন্টার মধ্যে অবিকৃত পলিমারাইজড অবস্থায় সিকামে পৌঁছে। এটি উল্লেখযোগ্য হারে মলের আর্দ্রতা ও ওজন বৃদ্ধি করে এবং মলের অন্ত্রীয় প্রবাহকাল কমায়। ইসবগুলে অবস্থিত দ্রবনীয় অশ্বেতসার পলিস্যাকারাইড এর অবায়বীয় গাঁজন অন্ত্রে শর্ট চেইন ফ্যাটি এসিড, এসিটেট, প্রোপিওনেট ও বিউটাইরেট উৎপন্ন করে। বিউটাইরিক এসিড কোলোনোসাইডের মধ্যে জারণ ঘটিয়ে আলসারেটিভ কোলাইটিস চিকিৎসায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ইসবগুল কোলেস্টেরল কমাতেও সাহায্য করে থাকে। ধারণা করা হয় যে ইসবগুল আলফাহাইড্রোক্সিলেজ ও HMG-CoA রিডাক্টেজ এর ক্রিয়া বৃদ্ধি করে কোলেস্টেরল শোষণ কমায়। ইসবগুল চেনো ডি-অক্সিকোলিক ও কোলিক এসিডের অংশ বৃদ্ধি করে এবং LDL কোলেস্টেরল কমায়।

নির্দেশনা ও ব্যবহার

ইসপারগুল কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ ও আলসারেটিভ কোলাইটিসে নির্দেশিত। এছাড়া এটি হাইপারলিপিডেমিয়া, ভোজনোত্তর ডায়াবেটিস ও পেটের পীড়ায় উপকারী।

মাত্রা ও সেবনবিধি

প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ৩.৫ গ্রাম (১টি স্যাশে অথবা এক চা চামচ পাউডার) দিনে ২ থেকে ৩ বার ১ গ্লাস পানিসহ সেব্য। অথবা (এক চা চামচ পাউডার) দিনে ২ থেকে ৩ বার ১ গ্লাস পানিতে নিয়ে ৩ থেকে ৫ সেকেন্ড নেড়ে খেতে হবে। ইসপারগুল অন্য ওষুধ গ্রহণের ৩০ থেকে ৬০ মিনিট আগে অথবা পর খেতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও সতর্কতা

ইসবগুল সুসহনীয় ও নিরাপদ। সঠিক পদ্ধতিতে গ্রহণ না করলে (অল্প পানি দিয়ে খেলে) এটি ফুলে বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের খাদ্যনালী এবং অন্ত্রে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে। প্যানক্রিয়েটিক ইনসাফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়

যাদের পরিপাকনালী অস্বাভাবিকভাবে সংকীর্ণ, অন্ত্রনালীর অবস্ট্রাকশন, গলাধঃকরণে জটিলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

যষ্ঠিমধু, বিরেচক ও অ্যান্টিডায়াবেটিক ওষুধের সাথে সমসাময়িক ব্যবহার করলে শরীরে পটাশিয়াম এবং গ্লুকোজের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। কার্বামেজেপাইন এর সাথে সমসাময়িক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্বামেজেপাইনের বায়োএভেইলিবিটি কমে যেতে পারে।

গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার

কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না।

৬ - ১২ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে: ২ থেকে ৩.৫ গ্রাম (১/২ - ১টি স্যাশে)

সংরক্ষণ

সূর্যালোক থেকে দূরে, ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

ইসপারগুল প্রতিটি বাক্সে আছে ১৫টি ৩.৫ গ্রাম স্যাশে এবং প্রতিটি এইচ ডি পি ই কন্টেইনারে আছে ১২০ গ্রাম পাউডার।

ফুসিড®
ফিউরোসেমাইড

উপাদান

ফুসিড ট্যাবলেট : প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে ফিউরোসেমাইড বিপি ৪০ মি.গ্রা.।

ফুসিড ইঞ্জেক্শন : প্রতিটি ২ মি.লি. অ্যাম্পুলে আছে ফিউরোসেমাইড বিপি ২০ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজি

ফুসিড (ফিউরোসেমাইড) একটি মনোসালফোনাইল মূত্রবর্ধক। এটি একটি কার্যকরী মূত্রবর্ধক যা কম গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট (জিএফআর) এর ক্ষেত্রেও কার্যকরী। বৃক্কীয় নালিকার কার্যকারিতার উপর ফুসিড এর স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। এটি অন্যান্য মূত্রবর্ধকের চেয়ে সর্বোচ্চ মূত্রবর্ধনে সক্ষম। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে : (১) দ্রুত কার্যকরিতার সূত্রপাত ঘটায় (২) লুপ অব হেনলীর উর্ধ্বমুখী নালিকার সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড আয়নের পরিবহনে বাঁধা দান করে (৩) অম্লক্ষারকের ভারসাম্যের পরিবর্তনের সাথে এর কার্যকারিতা সম্পর্কযুক্ত নয়।

ফুসিড প্রধানত লুপ অব হেনলীর উর্ধ্বমুখী অংশে ইলেকট্রোলাইট পরিশোষনে বাঁধা দান করে।

ফিউরোসেমাইড পরিপাকতন্ত্র থেকে সহজেই শোষিত হয় এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্লাজমা প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত থাকে। এটি মূত্রের মাধ্যমে দ্রুত নিঃসৃত হয়। শিরাপথে প্রয়োগের পরে এর কার্যকারিতা ৫ মিনিটের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যা ২ ঘন্টা পর্যন্ত বজায় থাকে।

নির্দেশনা

ট্যবলেট : ফুসিড এমন একটি মূত্রবর্ধক যা দ্রুত এবং কার্যকরী মূত্রবর্ধনে সকল নির্দেশনায় ব্যবহৃত হয়। ফুসিড ৪০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট মেকানিক্যাল অবস্ট্রাক্শন অথবা ভেনাস ইনসাফিসিয়েনসি জনিত হৃদপিন্ড, ফুসফুস, বৃক্কীয় ও যকৃতের ইডিমা এবং উচ্চ রক্তচাপে নির্দেশিত।

ইঞ্জেক্শন : ফুসিড এমন একটি মূত্রবর্ধক যা দ্রুত এবং কার্যকরী মূত্রবর্ধনে সকল নির্দেশনায় ব্যবহৃত হয়। জরুরী অবস্থা অথবা যখন মুখে খাওয়া সম্ভব নয় তখন শিরাপথে ফুসিড প্রয়োগ করা যথার্থ। ফুডিস ইঞ্জেক্শন হৃদপিন্ড, ফুসফুস, বৃক্কীয় ও যকৃতের ইডিমায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

ফুসিড ট্যাবলেট

ইডিমা-প্রাপ্ত বয়স্ক : প্রারম্ভিক দৈনিক মাত্রা ৪০ মি.গ্রা. যার মাত্রা পরে কমিয়ে প্রতিদিন ২০ মি.গ্রা. অথবা ১ দিন পর পর ৪০ মি.গ্রা. করে সেবন করা যায়। কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ৮০ মি.গ্রা. বা তদূর্ধ্ব (ভাগ করা মাত্রা) মাত্রার প্রয়োজন হতে পারে। রেসিস্ট্যান্ট ইডিমার ক্ষেত্রে দৈনিক মাত্রা ৮০-১২০ মি.গ্রা.। তীব্র ইডিমায় আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ফিউরোসেমাইডের মাত্রা দৈনিক ৮০ মি.গ্রা. এর বেশি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা হয় তখন রোগীকে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষনের মধ্যে রাখতে হবে।

শিশু : নবজাতক- ০.৫-২ মি.গ্রা./কেজি দেহ ওজনে ১১-২৪ ঘন্টা অন্তর। (রজঃস্রাব পরবর্তী বয়স যদি ৩১ সপ্তাহের কম হয় তবে ২৪ ঘন্টা অন্তর ব্যবহার করতে হবে) ১-১২ মাস বয়সের শিশু: ০.৫-২ মি.গ্রা./কেজি দেহ ওজনে (রজঃস্রাব পরবর্তী বয়স যদি ৩১ সপ্তাহের কম হয় তবে ২৪ ঘন্টা অন্তর ব্যবহার করতে হবে)। রেসিস্ট্যান্ট ইডিমার ক্ষেত্রে উচ্চতর মাত্রার দরকার হতে পারে; প্রতি দিন সর্বোচ্চ ১২ মি. গ্রা. প্রতি কেজি দেহ ওজনে ব্যবহার করা যেতে পারে, দৈনিক মাত্রা ৮০ মি.গ্রা. অতিক্রম করা যাবে না।

১২-১৮ বছরের শিশু : প্রতিদিন ২০-৪০ মি.গ্রা., রেসিস্ট্যান্ট ইডিমার ক্ষেত্রে মাত্রা বৃদ্ধি করে প্রতিদিন ৮০-১২০ মি.গ্রা. ব্যবহার করা যেতে পারে।

বয়ঃবৃদ্ধ : ফিউরোসেমাইড বয়ঃবৃদ্ধ রোগীদের ক্ষেত্রে খুব ধীরে ধীরে শরীর থেকে নির্গত হয়। পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া না পাওয়া পর্যন্ত মাত্রা পরিবর্তন করে সেবন করা উচিত।

উচ্চ রক্তচাপ

প্রাপ্তবয়স্ক : সাধারণত উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রে ফিউরোসেমাইড এর প্রারম্ভিক মাত্রা ৮০ মি.গ্রা. যা প্রতিদিন ২টি বিভক্ত মাত্রায় সেবন করা যেতে পারে। প্রতিক্রিয়া অনুসারে তারপর মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। প্রতিক্রিয়া সন্তোষজনক না হলে অন্যান্য উচ্চরক্তচাপ প্রশমনকারী ওষুধ সংযোজন করা যেতে পারে।

শিশু : শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণ মাত্রা ১-৩ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দেহ ওজনে যা দৈনিক সর্বোচ্চ ৪০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

বয়ঃবৃদ্ধ : ফিউরোসেমাইড বয়ঃবৃদ্ধ রোগীদের ক্ষেত্রে খুব ধীরে ধীরে শরীর থেকে নির্গত হয়। পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া না পাওয়া পর্যন্ত মাত্রা পরিবর্তন করে সেবন করা উচিত।

ফুসিড ইঞ্জেক্শন

ইডিমা

প্রাপ্ত বয়স্ক : প্রারম্ভিক অবস্থায় ইন্ট্রামাসকুলার অথবা ইন্ট্রাভেনাস পথে ২০-৫০ মি.গ্রা. দেয়া যেতে পারে। যদি বেশি মাত্রার ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাহলে ২০ মি.গ্রা. করে বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং তা প্রতি ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। ৫০ মি.গ্রা. এর বেশি মাত্রার ওষুধ

প্রয়োগের প্রয়োজন হলে তা ধীরে ধীরে ইন্ট্রাভেনাস ইনফিউশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ফিউরোসেমাইড ইঞ্জেক্শনের দৈনিক সর্বোচ্চ প্রয়োগ মাত্রা ১৫০০ মি. গ্রা.।

শিশু : (ধীর গতি ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেক্শনের মাধ্যমে)

নবজাতক : ০.৫-১ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দেহ ওজনে প্রতি ১২-২৪ ঘন্টা অন্তর।

১ মাস-১২ বছরের শিশু : ০.৫ -১ মি.গ্রা. প্রতি কেজি ওজনে যা প্রয়োজন অনুসারে প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর সর্বোচ্চ ৪০ মি.গ্রা. প্রতি কেজি ওজনে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১২-১৮ বছরের শিশু : প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রতি ৮ ঘন্টায় ২০-৪০ মি.গ্রা. পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। রেসিস্ট্যান্ট ইডিমার ক্ষেত্রে উচ্চতর মাত্রার দরকার হতে পারে।

অবিরাম ইন্ট্রাভেনাস ইনফিউশনের মাধ্যমে

১ মাস-১৮ বছরের শিশু:প্রতি ঘন্টায় ০.১-২ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দেহ ওজনে। হৃদপিন্ডে অস্ত্র পাচারের পরে প্রারম্ভিকভাবে প্রতি ঘন্টায় ১০০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি কেজি দেহ ওজনে, মূত্র নির্গমনের পরিমাণ প্রতি ঘন্টায় ১ মি.লি. প্রতি কেজি ওজন না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োগমাত্রা প্রতি ২ ঘন্টা অন্তর দ্বিগুন করা যেতে পারে।

বয়ঃবৃদ্ধ : ফিউরোসেমাইড বয়ঃবৃদ্ধ রোগীদের ক্ষেত্রে খুব ধীরে ধীরে শরীর থেকে নির্গত হয়। পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া না পাওয়া পর্যন্ত মাত্রা পরিবর্তন করে সেবন করা উচিত।

উচ্চ রক্তচাপ

প্রাপ্ত বয়স্ক : প্রারম্ভিক অবস্থায় ইন্ট্রামাসকুলার অথবা ইন্ট্রাভেনাস পথে ২০-৫০ মি.গ্রা. দেয়া যেতে পারে। যদি বেশি মাত্রার ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাহলে ২০ মি.গ্রা. করে বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং তা প্রতি ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। ৫০ মি.গ্রা. এর বেশি মাত্রার ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হলে তা ধীরে ধীরে ইন্ট্রাভেনাস ইনফিউশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ফিউরোসেমাইড ইঞ্জেক্শনের দৈনিক সর্বোচ্চ প্রয়োগ মাত্রা ১৫০০ মি. গ্রা.।

শিশু : দৈনিক মাত্রা ০.৫-১.৫ মি.গ্রা./কেজি দেহ ওজনে সর্বাধিক দৈনিক মাত্রা ২০ মি.গ্রা. পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে।

বয়ঃবৃদ্ধ : ফিউরোসেমাইড বয়ঃবৃদ্ধ রোগীদের ক্ষেত্রে খুব ধীরে ধীরে শরীর থেকে নির্গত হয়। পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া না পাওয়া পর্যন্ত মাত্রা পরিবর্তন করে সেবন করা উচিত।

প্রতিনির্দেশনা এবং সতর্কতা

ফিউরোসেমাইড অ্যানুরিয়া, ইলেকট্রোলাইট এর অভাবে এবং প্রি-কমাটোজ স্টেটস সম্পর্কিত লিভার সিরোসিস এর ক্ষেত্রে প্রতি নির্দেশিত। যাদের ফিউরোসেমাইড অথবা সালফোনেমাইড এর প্রতি হাইপারসেনসিটিভিটি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ফিউরোসেমাইড প্রতি নির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

অন্যান্য মূত্রবর্ধকের সাথে দীর্ঘসময় ধরে ফুসিড ব্যবহারের ফলে ইলেকট্রোলাইট ও পানির ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে অ্যালকালোসিস হতে পারে। ফুসিড ইউরিক এসিডের নিঃসরণে বাধা দিতে পারে এবং কদাচিৎ তীব্র গেটে বাঁতের সৃষ্টি করে। ফিউরোসেমাইড রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং মূত্রে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়াতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

যখন ফিউরোসেমাইড এসিই ইনহিবিটর এর সাথে ব্যবহার করা হয় তখন রক্তচাপ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যেতে পারে। লিথিয়াম ফিউরোসেমাইড এর সাথে ব্যবহার করলে রক্তরসে লিথিয়ামের পরিমান বেড়ে যায়। নেফ্রোনের জন্য বিষাক্ত এন্টিবায়োটিকের সাথে ফিউরোসেমাইডের ব্যবহারে এন্টিবায়োটিকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া বেড়ে যেতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

পালমোনারী ইডিমাজনিত কার্ডিওজেনিক শক্ এর ক্ষেত্রে এবং গর্ভবতী মায়েদের প্রথম ৩ মাসের মধ্যে ফিউরোসেমাইড সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। ইলেকট্রোলাইট অভাবজনিত রোগীদের সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। স্তন্যদানকারী মায়েদের ফুসিড ব্যবহারে দুগ্ধ নিঃসরণ বন্ধ হতে পারে অথবা মাতৃদুগ্ধে ফুসিড নিঃসৃত হতে পারে। সেক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

সংরক্ষণ

আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠাণ্ডা স্থানে রাখুন।

সরবরাহ

ফুডিস ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ২০০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাক-এ।

ফুসিড ইঞ্জেক্শন : প্রতিটি বাক্সে আছে ১০টি অ্যাম্পুল ব্লিস্টার প্যাক-এ।

রজঃ চক্র জনিত বিভিন্ন সমস্যার কার্যকরী চিকিৎসায়

DEDICATED MANUFACTURING FACILITY FOR HORMONE & STEROID PRODUCTS

Menoral®

Norethisterone 5 mg Tablet

- কার্যকরী প্রজেস্টেরন
- রজঃ চক্র জনিত বিভিন্ন সমস্যায় অত্যন্ত কার্যকরী
- দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় অন্যান্য প্রজেস্টেরনের তুলনায় নিরাপদ

LECOR™

Patrangasav 200 ml syrup

লিউকোরিয়ার চিকিৎসায় একটি প্রাকৃতিক সমাধান

- সংক্রমণকারী এবং অসংক্রমণকারী জীবাণুর দ্বারা সংঘটিত যোনির প্রবাহকে প্রতিরোধ করে
- হরমোনাল অসামঞ্জস্যতা ও অপুষ্টিজনিত লিউকোরিয়াতে কার্যকরী
- প্রচলিত ঔষধের চেয়ে অধিক নিরাপদ
- চিকিৎসাগত ভাবে কার্যকরী ও নিরাপদ
- আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী এবং চিনিমুক্ত

লিকর™
পত্রাঙ্গাসব

www.squarepharma.com.bd

SQUARE
HERBAL & NUTRACEUTICALS LTD
(AYURVEDIC DIVISION)

ব্যবহার বিধি:

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য: ৩ চা চামচ (১৫ মিলি.) দিনে ৩ বার আহারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

Since 1958

SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH

www.squarepharma.com.bd
facebook.com/SquarePharmaLtd
twitter.com/SquarePharmaBD

SQUARE

Mixed Orange & Mango Flavor Tastes Sweet

Rice ORS®

Rice based Oral Rehydration Saline

রাইস ওআরএস®

৫০০ মি.লি. স্যালাইন প্রস্তুতের জন্য

স্যালাইন তৈরীর পূর্বে উভয় হাত
সাবান ও পানি দিয়ে পরিষ্কার করুন।

একটি পরিষ্কার পাত্রে ৫০০ মি.লি. (প্রায় দুই গ্লাস) ফুটন্ত পানি ঢালুন।

একটি প্যাকেটের সবটুকু স্যালাইন পানিতে ঢালতে ঢালতে নাড়তে থাকুন।

চামচ দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে নিন।

প্রস্তুতকৃত স্যালাইন রোগীকে নিম্নবর্ণিত মাত্রা অনুযায়ী প্রয়োজনমত খেতে দিন।

২৫০ মি.লি. স্যালাইন প্রস্তুতের জন্য

স্যালাইন তৈরীর পূর্বে উভয় হাত
সাবান ও পানি দিয়ে পরিষ্কার করুন।

একটি পরিষ্কার পাত্রে ২৫০ মি.লি. (প্রায় দুই গ্লাস) ফুটন্ত পানি ঢালুন।

একটি প্যাকেটের সবটুকু স্যালাইন পানিতে ঢালতে ঢালতে নাড়তে থাকুন।

চামচ দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে নিন।

প্রস্তুতকৃত স্যালাইন রোগীকে নিম্নবর্ণিত মাত্রা অনুযায়ী প্রয়োজনমত খেতে দিন।

Since 1958

SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH

www.squarepharma.com.bd
facebook.com/SquarePharmaLtd
twitter.com/SquarePharmaBD

SQUARE

মেডিকেল সার্ভিসেস বিভাগ, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, কর্পোরেট হেড কোয়ার্টার্স: স্কয়ার সেন্টার
৪৮, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২, ফোন : ৮৮৩৩০৪৭-৫৭, ৮৮৫৯০০৭ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮২ ৮৬০৮, ৮৮২ ৮৬০৯
E-mail : info@squaregroup.com, Web : http://www.squarepharma.com.bd
Production: Rains.Com